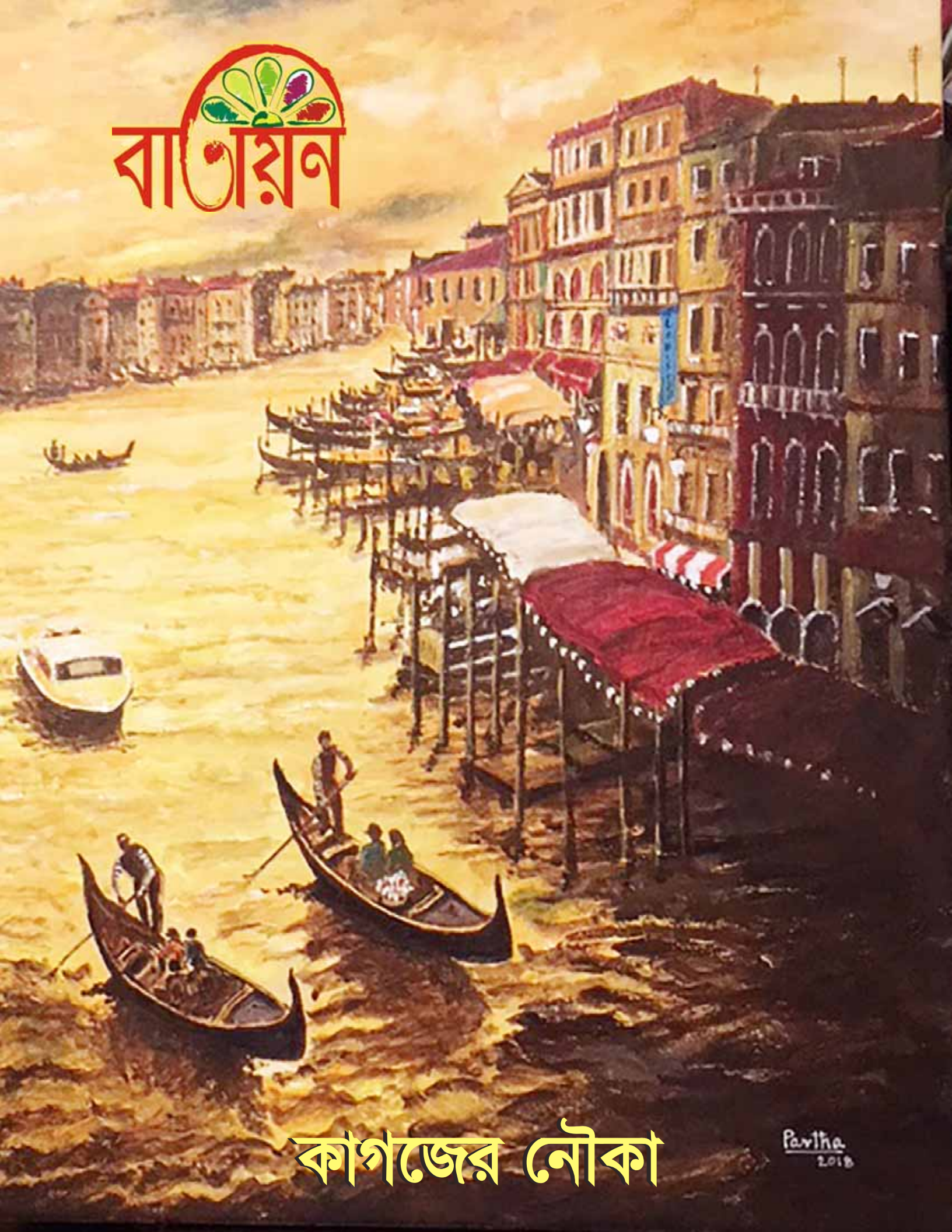

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

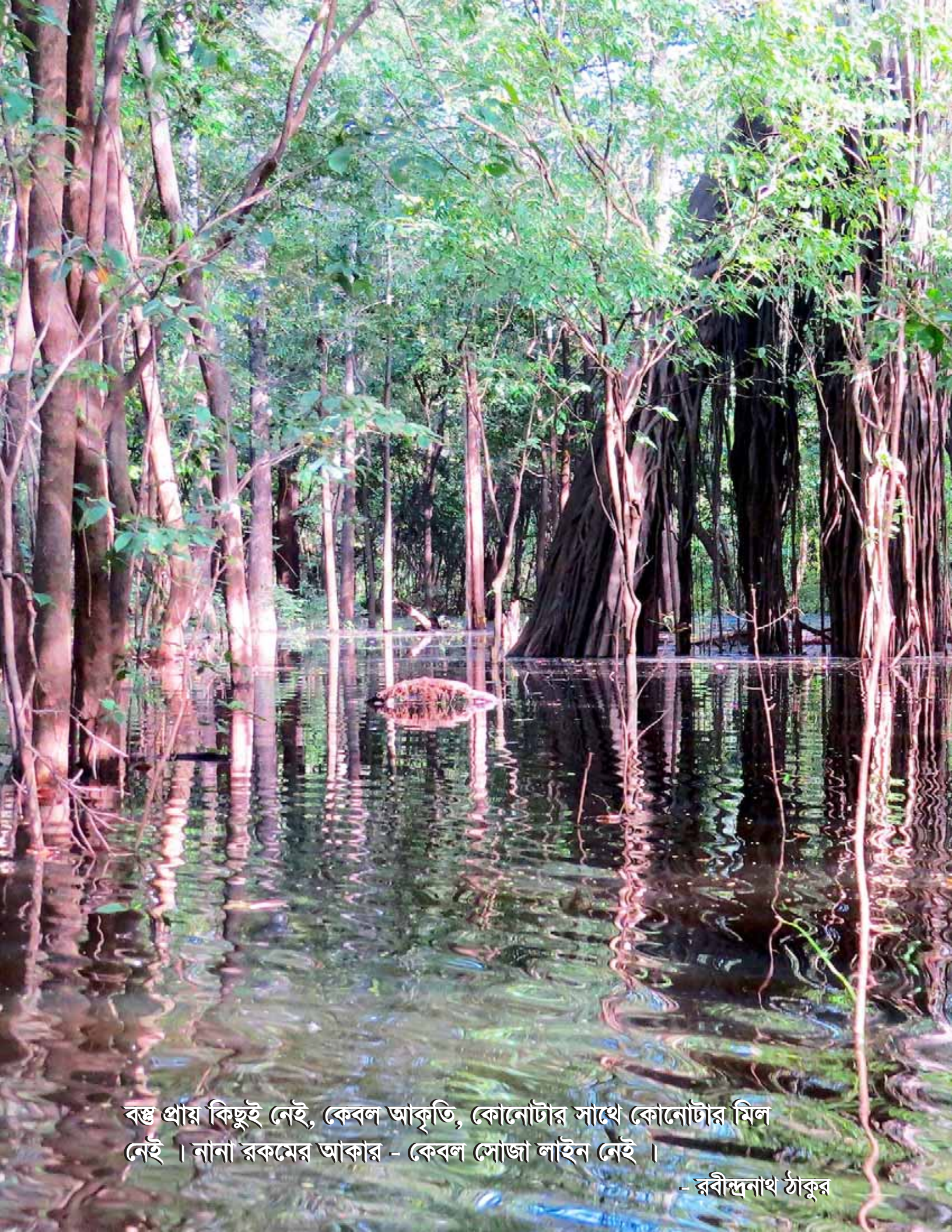

বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নেই । নানা রকমের আকার - কেবল সোজা লাইন নেই ।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

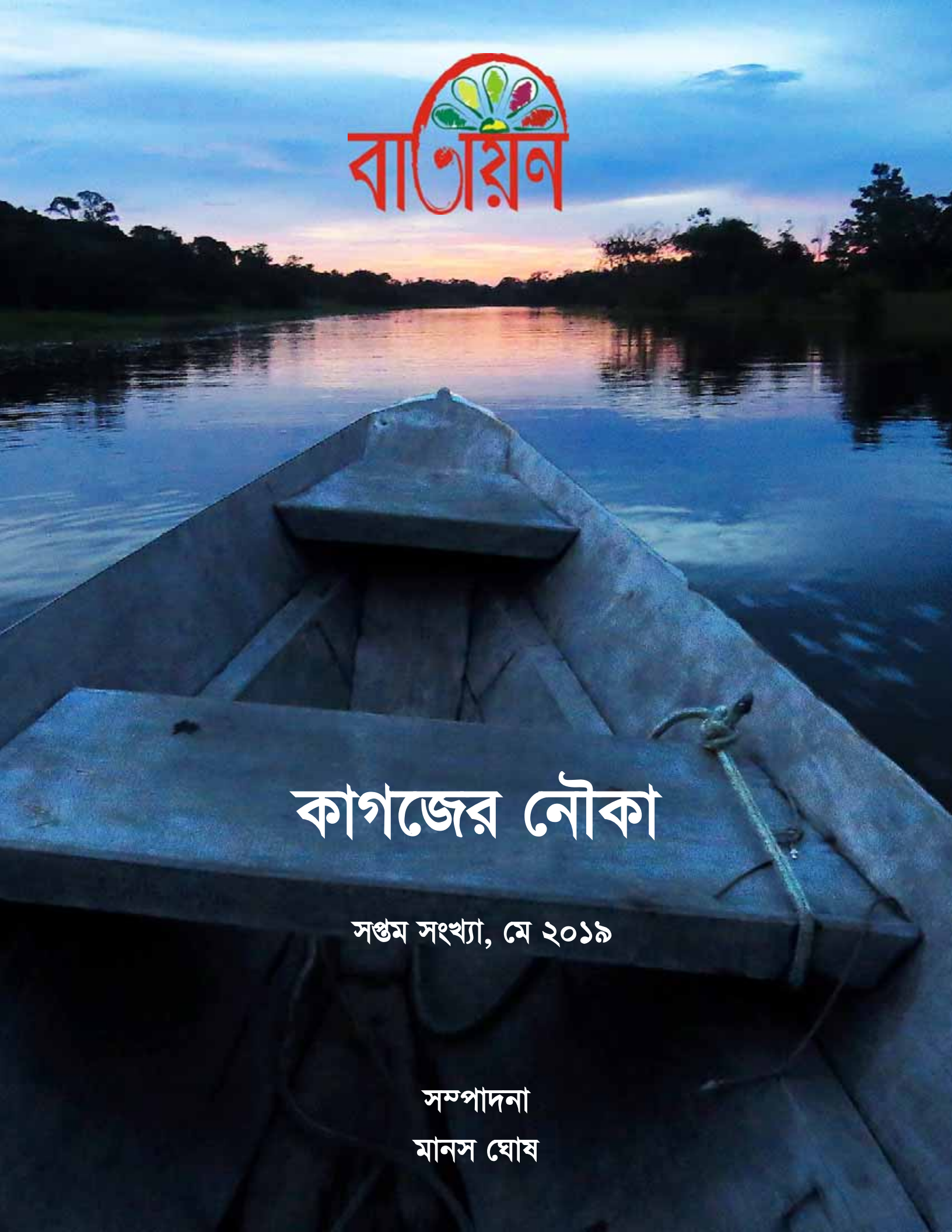

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

সপ্তম সংখ্যা, মে ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 7 : May 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh — **Venice Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Atanu Biswas, IL, USA — **Front Cover**

He is a scientist by profession who came to USA from Kolkata in 1980. However, more people know him as the face of Biswas Records, which he founded in 1994. In recognition of Biswas Record's contribution to Bengali music, the North American Bengali Conference (NABC) twice awarded Dr. Atanu Biswas its highest award at San Francisco Bay Area (1999) and at Detroit (2007). He is embracing photography as his hobby and constantly aiming to develop the photography skill.

Milan Bhattacharjee — **'El Ateneo' in Buenos Aires : Inside Back Cover**

He is the President of Bongo Sanskriti Australia (a registered cultural organisation in Canberra, Australia).
Dr Bhattacharjee has a diverse and wide experience in teaching, scientific research and administration in India and Australia.

Three weeks ago I had the opportunity to visit " El Ateneo" in Buenos Aires (Argentina). This building used to be a Theatre called " Teatro Gran Splendid " and still retains the feeling of a grand theatre it was once and in 1929 had showed the first sound films presented in Argentina. The Director of this Shop informed me that several million overseas book readers visit the bookshop annually.

Tirthankar Banerjee — **Back Cover**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা . . . .

রবীন্দ্রকবিতা আর কালবৈশাখী ঝড়ের যুগলবন্দীতে সূচনা হল বাংলা নববর্ষের। দেশ, ধর্ম বা জাতিভেদের ব্যবধান মুছে ফেলা এই উৎসবের দিনে বাতায়ন পরিবারের পক্ষ থেকে আপামর বাঙালীকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা !

কলকাতায় বৈশাখের তীব্র দহন, শিকাগোর রাস্তা হয়ত এখনো বরফের চাদরে ঢাকা, আবার সিডনীর বাগানে হয়ত আজ সদ্য ফোটা নেরিন-গুচ্ছের মন ভালো করে দেওয়া গোলাপি আভা। তবু . . . আজ বৈশাখ, নতুন বছর আর রবীন্দ্রজয়ন্তীর মাস, তাই বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা বাঙালীকে জড়িয়ে থাকুক এই বৈশাখী আত্মীয়তা।

তেমনি সমস্ত পাঠক-লেখক-প্রকাশককে আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধেছে ২৩শে এপ্রিল, – 'বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস'। "বই পড়ুন, বই পড়ান, বই উপহার দিন" স্লোগানের সঙ্গে আমাদের সংযোজন, 'বই পড়ে কয়েকলাইন পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখে পাঠান। সেটা প্রকাশিত হবে, বাতায়নের ত্রৈমাসিক বা মাসিক (কাগজের নৌকা) সংখ্যায়। আমরাও পরিচিত হই আপনার ভালো লাগা বইটার সঙ্গে।'

এদিকে কাগজের নৌকার ধারাবাহিকগুলি নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। চূড়ান্ত কৌতূহলের মুহূর্তে ... 'ক্রমশ' বা 'পরের সংখ্যায়' লেখার জন্য কেউ কেউ সম্পাদককে খলনায়ক বলতেও ছাড়ছেন না। নবকুমার বসুর 'হটবাহার' প্রবাসী মহলে আলোড়ন ফেলেছে। তাঁরা বলছেন, প্রবাসী জীবনের ভালো-মন্দ-সমস্যা-জটিলতার এমন নিখুঁত আর চেনা ছবি উপন্যাসে পেয়ে তাঁরা মুগ্ধ। এরপর ঘুর্ণায়মান মঞ্চের মতো কাগজের নৌকার পাতা ওল্টালেই ইংল্যান্ডের 'প্রিন্স উইলোবি' থেকে 'সময়' -এর হাত ধরে সোজা, ৯০-এর দশকের কলকাতা, একঝাঁক কলেজ পড়ুয়ার মধ্যে (লিখেছেন সৌমিত্র চক্রবর্তী), এদিকে পরের দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে কলকাতার উপকণ্ঠে হাইওয়ের ধারে রমাদি'র 'চা- ঘর'। বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে, সুজয় দত্তের অনুবাদে পুষ্পা সাক্সেনা'র গল্প। প্রসিদ্ধ কবি পল্লববরণ পালের সনেট তো ছিলই, তার সঙ্গে কবিতা সিরিজ নিয়ে যোগ দিয়েছেন সিডনির কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী। অনিমেষবাবুর কলমে পাওয়া যাবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা। বাংলাদেশের প্রাক্তন অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের স্মৃতিচারণায় নতুন করে পরিচয় হবে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু'র সঙ্গে।

এবারের কাগজের নৌকা নতুন করে সেজে উঠেছে শিল্পী পার্থপ্রতিম ঘোষের আঁকা ছবি (প্রচ্ছদ), অতনু বিশ্বাস ও মিলন ভট্টাচার্যের তোলা দুর্দান্ত ফটোগ্রাফে। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এদিকে অশুভ শক্তির দাপাদাপি অব্যাহত। নিউজিল্যান্ডের পর এবার শ্রীলঙ্কা। মানবসভ্যতার এইসব অন্ধকার দিনেও আমরা লিখে চলেছি। কেননা . . . show must go on . . . . . কলম থামালে চলবে না। সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা চলতে থাক, আরো বেশী মানুষকে তাতে সামিল করতে হবে, ঘৃণা আর হিংসার আঁধার কাটিয়ে বিদ্বেষমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে, এই অক্ষরমালা থেকেই ছড়িয়ে পড়ুক সুচেতনার অনুরণন। আর বাতায়নের এই 'শুভকর্মপথে' সবচেয়ে বড় প্রেরণা হোক আপনাদের পাঠের আগ্রহ ও ভালোবাসা।

ভালো থাকবেন।

মানস ঘোষ
সম্পাদক/কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	5
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	14

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	17

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	ভৌতিক	22
তপনজ্যোতি মিত্র	ঈশ্বরকে স্পর্শ	25

স্মৃতিকথা

শহিদুল ইসলাম	"সত্যেন বোস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরি"	31

অনুবাদ

সুজয় দত্ত	রৌদ্রছায়া	34

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	27
সঞ্জয় চক্রবর্তী	আয়ো বরষিয়া	28
স্বপন ভট্টাচার্য	সফর	29
পার্থ প্রতিম ঘোষ	বিক্ষত ভগবান	30

প্রবন্ধ

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	এই ফড়িঙের বাগানে একাকী এক গাছ	47

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৭

(১৩)

ট্রাভেল এজেন্ট্ মিসেস্ চ্যাটার্জি বহুদিনের চেনা, বরাবর ওঁর কাছ থেকে দেশে যাওয়ার টিকিট কেটে আসছেন সুদীপারা। ভদ্রমহিলার স্বামীও ডাক্তার, তাছাড়া বঙ্গসন্তান বলেও কথাবার্তা বলতে সুবিধে হয়। টিকিট কাটার সূত্রে দু-একটা অন্য কথাও যে হয় না তা নয়। ভদ্রমহিলার স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রখর।

সুদীপা জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের টিকিট চাইতেই মিসেস্ চ্যাটার্জি টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বললেন, আপনি সান্ডারল্যান্ড-এর মিসেস রায় তো . . . ডক্টর রজতাভ রায়ের . . . ?

হ্যাঁ . . . ঠিকই বলেছেন মিসেস্ চ্যাটার্জি।

আপনি গত মার্চেই ফিরেছেন না দেশ থেকে !

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন . . . আপনার মেমারি বেশ ভাল।

কাজ করতে-করতেই হয়েছে। উপায় কী বলুন . . . মাঝেমধ্যেই যাঁদের যাতায়াত করতে হয়, চেষ্টা করি যতটা রিজনেব্‌ল প্রাইস-এ তাঁদের টিকিট দিতে পারি . . . সেই জন্যই। আপনার কি জুলাইতে যেতেই হবে ?

ইনফ্যাকট্ . . . জুন-এ যেতে পারলেই ভাল হতো . . . কিন্তু হচ্ছে না . . .।

আসলে স্কুল-হলিডে তো . . . পুরো জুলাই মাসেই ফ্লাইট বড্ড হাই প্রাইসড্।

উপায় নেই মিসেস চ্যাটার্জি . . . কোর্ট কেস-এর ডেট পড়েছে . . . আর ডেফার করা যাবে না।

ওই রকম কিছু একটা আন্দাজ করছিলাম . . . ডক্টর রায় চলে যাওয়ার পরে আপনার খুব হ্যাসেল যাচ্ছে . . .।

কী আর বলব বলুন . . . এই টানাপোড়েনের হাত থেকে আমাদের কি আর রেহাই আছে ! এখন আবার একা মানুষ . . .। কিছুটা অভিজ্ঞতা আমারও আছে মিসেস্ রায়। প্রপার্টি সংক্রান্ত ঝামেলা নিশ্চয়ই ?

আর কী ! এন আর আই-তো ভিকটিম . . .। এদিকে এখানেও কি কম দায়িত্ব !

আমি দেখছি মিসেস রায় . . . একটু ফ্লেক্সিবল ডেট হলে অসুবিধে নেই তো ?

বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হলেও হবে . . .।

আমি আপনাকে রিংব্যাক করব . . . না-থাকলে মেসেজ রাখবো . . . মনে আছে আপনার তো নিউক্যাস্‌ল থেকে . . . ওকে বাই। টেলিফোন ছেড়েও ঝুম হয়ে বসে রইলেন সুদীপা। সকাল সাড়ে দশটা বাজে। বসে থাকার কথা নয়। মাথার মধ্যে এবং ঘরে-বাইরে কাজের পাহাড় জমে আছে। অথচ হুড়োহুড়ি ব্যস্ততার মধ্যে কোথায় যেন চালিকা শক্তির অভাব . . . সবকিছু করার পরেও মনে হয় — এই শ্রম, এই ব্যস্ততা সবই আনন্দহীন। করতে হবে বলে করা।

বড় মানুষেরা বলে থাকেন, ফলের আশা না করে কাজ করে যাও।

কথাটা যে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজ করে যাওয়ার পক্ষে দামি উপদেশ, সুদীপা যে সেটা বোঝেন না, কিংবা নিজের জীবনের ক্ষেত্রে কখনও ব্যবহার করেন নি, তা নয়। তাহলেও আজ মনে হয়, একটা কিছু প্রত্যাশা, এমনকী তা কাল্পনিক হলেও . . . কিংবা কোথাও কারো কাছ থেকে একটু ইতিবাচক মন্তব্য শোনা . . . কাজ এবং শ্রমের জন্য দুটো প্রশংসার কথা শোনা . . . তাঁর মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে কি খুব বেশি চাওয়া . . . খুব বেশি আশা করা ! ওটুকুও না-থাকলে কাজ করার আনন্দ-শক্তি-উদ্যমও কি একটু ঝিমিয়ে পড়ে না ! হ্যাঁ কাজের আনন্দে কাজ করে যাওয়া ব্যাপারটা যে সুদীপা একেবারে বোঝেন না, তাও না। কিন্তু আপাতত একা একা যেসব কাজগুলো তিনি করে চলেছেন, সত্যিই যে তা কাজের আনন্দে মশগুল হয়ে করছেন, তা তো না।

অনেকটাই করছেন দায়িত্ববোধ থেকে। শেষপর্যন্ত যে এসব করে তিনি কতখানি উপকৃত হবেন, কতটা তাঁর কাজে লাগবে, সে ব্যাপারে তো পরিচ্ছন্ন কোনো ধারণাও নেই। না-করলে পড়ে থাকবে অব্যবহৃত হয়ে — একমাত্র সেই বোধ থেকে কাজ-দৌড়ঝাঁপ-ছোটাছুটি। এমনকী ছেলেমেয়ের-ও যেন সেরকম কোনো আগ্রহ নেই জানার। এ্যাপ্রিশিয়েট করা তো পরে।

এদিকে এমন কতকগুলো সব দায় ফেঁদে বসে আছেন যে মাঝপথে ছেড়ে দাওয়াও সম্ভব না। অথচ এই বাড়িঘর কেনা তার আইনগত খুঁটিনাটি বোঝা, সলিসিটরদের সঙ্গে যোগাযোগ, রেজিস্ট্রেশন, কাউন্সিল ট্যাক্স্ নিয়ে আলোচনা, হেলথ-হ্যাজার্ড আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া . . . এবং তারপরেও রিপেয়ার, গ্যাস-ইলেক্ট্রিসিটি-ওয়াটার-টেলিফোন কানেকশন . . . সমস্ত কিছু রেডি করার পরে স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা; নয়তো কোনো এজেন্টকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া . . . সহজ ব্যাপার না।

ছোটবেলায় বাবার কাছে একটা কথা শুনতেন সুদীপা — যে, বাড়ির কাজ কোনোদিন শেষ হয় না।

আর একটা কথাও শুনতেন। — মিস্ত্রির আর এক নাম গ্রহ (কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় গেরো)। ঠেলে না তাড়ালে যাবে না। দুটো ব্যাপারই এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। তাও এদেশে বাড়িভাড়া দেওয়ার ব্যবসা যাঁরা করেন (যাঁদের অতিরিক্ত পয়সা থাকে, প্রায় সবাই করেন), তাদের মতো দশ-বারো-পনেরটা নয়, সান্ডারল্যান্ড এলাকার মধ্যে অনেক দেখেশুনে হিসেব করে সুদীপা মাত্র দুখানা বাড়ি তথা চারখানা ফ্ল্যাট (ওপর-নিচে করে)-এর ব্যবস্থা করেছেন শেষপর্যন্ত। আর সেটাও অবশ্য সম্ভব হয়ে ছিল — সৌমেন দত্তর প্রাথমিক সাজেশন এর পরে এবং প্রতিবেশি রুথ এবং মাইকেল পার্কারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়।

মাইকেল অবশ্য নিজেই প্রতিবন্ধী ছিলেন বেশ কিছু বছর ধরে। তাহলেও নিঃস্বার্থভাবে কম সাহায্য করেন নি বাড়িতে বসে। কাগজপত্র দেখে-দেখে, পড়ে পড়ে দিনের পর দিন এ্যাডভাইস দিয়েছেন সুদীপাকে। এটা খোঁজ নিতে বলেছেন, ওটা চেক্ করতে বলেছেন, কোনটা সলিসিটরকে জিগ্যেস করতে বলেছেন। আর রুথ-এর তো কথাই নেই। সুদীপাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ছুটেছেন কাউন্সিলের এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আর এক জায়গায়। ঠিক ঠিক লোক চিনিয়ে দিয়েছেন। হোমকেয়ার-এর দোকানে-দোকানে নিয়ে গেছেন। চেনা মিস্ত্রি-ইলেক্ট্রিশিয়ান-প্লাম্বার-রুফার জুটিয়ে দিয়েছেন। আর এসব ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ-আনাড়ি সুদীপা বিগত দেড়মাস ধরে একটু একটু করে চড়কো হয়ে উঠেছেন . . . কিংবা উঠছিলেন বলাই ভাল।

অথচ কপালই বলতে হবে . . . মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই একটা স্ট্রোক হয়ে চলে গেলেন মাইকেল। বয়স হয়েছিল মাত্র বাহাত্তর। কে জানে, হয়তো ওঁর দিক থেকে ভালই হয়েছিল . . . এমনকী রুথ-এর দিক থেকেও হয়তো। কিন্তু মানুষটার অভাব এখনও খুব অনুভব করেন সুদীপা। শুধু সাহায্য করতেন বলেই না। অমন নিঃস্বার্থ-আন্তরিক-বিশ্বাসী মানুষ জীবনে প্রায় দেখেন নি তিনি। কাজটা যেন সুদীপার ছিল না। মাইকেল আর রুথেরই দায়িত্ব ছিল। অথচ বিদেশ-বিভুঁইয়ে নেহাৎ প্রতিবেশি ছাড়া আর তো কোনোই যোগাযোগ-সম্পর্ক-মিল . . . কিছুই ছিল না ওঁদের সঙ্গে। মানুষ সত্যি এমন ও হয় ! রুথ অবশ্য সুদীপাকে ত্যাগ করেন নি। মাইকেল-এর ফিউনারলস এর পরে, মেয়ের কাছে ডেভনশায়ারে যাওয়ার আগে দেখা করে এবং কথা বলে গেছেন। সঙ্গে রেখে গেছেন-কালো বিনব্যাগের মধ্যে ভর্তি করা অনেক জামাকাপড়-চাদর-কম্বল-পর্দা এবং নানান টুকিটাকি ঘর-গেরস্থালির জিনিস। ও সবই যাবে চ্যারিটিতে।

সুদীপাকে বলেছেন, রেডক্রশ-এর গাড়ি আসবে তিনদিন পরে। 'হেল্‌প দ্য হোমলেস' ডিপার্টমেন্ট সব নিয়ে যাবে তোমার বাড়ি থেকে। আমি টেলিফোন করে বলে রেখেছি... তোমার সুবিধামতো সময়েই ওরা আসবে।

সুদীপা বলেছেন, আমি তোমাকে খুব মিস করবো।

রুথ ওই মানসিক অবস্থাতেও ঠাট্টা করে বলেছিলেন, নট ফর আ লং টাইম। ... জুলাইয়ের গোড়াতেই আমি ফিরে আসব। তুমি কি সিল্ক উইলোবিতেই থাকবে?

অফকোর্স। কোথায় যাব এই বাড়ি, এই চেনাজানা-লোকজন-বন্ধুবান্ধব ছেড়ে!

মেয়ে-জামাই... নাতি নাতনিরা ছাড়বে তোমায় একা?

ওরা বলবে থাকতে এবং আমি থাকবো না — এটাই তো ভদ্রতা, সামাজিকতা দীপা ...। বেসিক্যালি সবাই তো একা-ই। একটা অভ্যাস হয়ে যায় একসঙ্গে থাকতে থাকতে... অভ্যাস কেটেও যায়। তাছাড়া আমার উইলো (কুকুর) আছে। তাহলে এখন যাচ্ছো যে!

জাস্ট ফর টাইম আউট এ্যান্ড রিপেয়ার অব দ্য মাইন্ড...।

সুদীপা মনে মনে ভেবেছিলেন, এই জাতটা সত্যি বেশ সাহসী এবং শক্ত। আবার কবিতাহীন এবং বাস্তব। অবশ্য তাঁদের মধ্যে তফাৎও আছে বৈকি! রুথদের কাছে এদেশই হচ্ছে মা-মাটি-মানুষ। জন্মভূমি-মাতৃভূমি দুইই ওঁদের এই দেশ। সেখানে সুদীপারা ভুঁইফোঁড়-বিদেশি-প্রবাসী। পার্থিব-সভ্যতার নিরিখে কিছু মানুষের ঠিকানা অদল বদল হয়ে যায়। অথচ কেউ কেউ তাঁদের 'না-ঘরকা, না ঘাটকা' অভিধায় ভূষিত করে। উদাসীনতা দেখান দেশিয় মানুষরাও। কে জানে সত্যি সত্যি কেউ ভেবে দেখেন কিনা, সৌহার্দ্য এবং সৌভ্রাত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে তথাকথিত পরদেশি-প্রবাসীদের একটা মানবিক-আন্তরিক-নিবিড় ভূমিকা কি নেই!

সময়ের ব্যাপারে সতর্ক হলেন সুদীপা। বাইরে শুকনো রোদ আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় সতেজ হয়ে উঠেছে গাছপালা। পাতায়-ফুলে ভরে উঠেছে আপেল-চেরি-প্লাস গাছগুলো। ফল ধরতেও শুরু করেছে। দেখতে দেখতে জুন মাস শেষ হয়ে যাবে। হাতে মাত্র তিন থেকে চারসপ্তাহ সময় থাকবে কলকাতা যাওয়ার আগে। অথচ চারটে ফ্ল্যাটেরই রেজিষ্ট্রেশন হলেও, এখনও ঘরদোরের কাজ বাকি। ইনিশিয়াল পেমেন্টের পরে অবশ্য মর্টগেজ-এর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ... সুদীপা স্নান করতে ঢুকলেন। ...

যে লয়েডস্ ব্যাংকের সঙ্গে ট্রানজ্যাকশন, মর্টগেজ-এর ব্যবস্থাও তাদের সঙ্গে। টাকা জমা পড়বে ওখানে, খরচখরচা, পেমেন্ট-ও ওখান থেকে। সাদা-কালো ব্যাপার নেই এদেশে। সুদীপাকে মাইকেল বেঁচে থাকার সময়েই হিসেব করে অনেকটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, ওর কতটা, কী জায়গা হতে পারে। সুদীপা নিশ্চিন্ত হয়েছেন খানিকটা বুঝে, যে, রজতাভর এবং তাঁর নিজেরও টাকা-পয়সা বিনিয়োগ করে তাঁর লাভই হবে। তাছাড়া কিছু পেন্সন তো আছেই। বড় কথা, অতিরিক্ত টাকাটা ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু তাঁর আসল উদ্বেগ-দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তা তো দেশের, কলকাতার ব্যাপার নিয়ে। শুধু বাড়ি নয়, সম্পর্ক-আত্মীয়তা নিয়েও যে! যা শুনতে পাচ্ছেন ইদানীং, অশান্তি-ঝামেলা নাকি শ্রীরামপুরের বাড়িতেও শুরু হয়েছে।

এ কী অদ্ভুত এবং আশ্চর্য ব্যাপার যে, যাদের ভরসায়, যেখানে, স্বামী বিয়োগের পরে সুদীপা এতো বছর পরে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহী, সেখানে তারাই যেন তাঁকে উৎখাত করার পরিস্থিতি রচনা করে চলেছেন। না, নিশ্চয়ই সকলে না। তাহলেও একজন ঘরের মানুষের অনীহা, বিরোধিতাও কি বহুগুন হয়ে বাজে না!

অরুণাভ দিন দশেক আগে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছিল, বউদি, তুমি কবে আবার কলকাতা আসছো বলো তো? সুদীপা জানেন তাঁর দেওরটি ভাল মানুষ, যদিও তাঁর সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অরুণাভ জানে না। কিন্তু সে বোকা নয়। দাদা মারা

যাওয়ার পরে দেশে এসে বউদি যে খুব স্বচ্ছন্দে ছিল না, এমনকী শ্রীরামপুরের বাড়িতেও, এটা সে বেশ অনুমান করতে পারে। কিন্তু কখনই সেই সুযোগ হয়নি যে সুদীপার সঙ্গে বসে আলোচনা করবে।

সুদীপা একটু হালকা সুরেই বলেছিলেন, শুধু সেইটা জানার জন্য অতদূর থেকে টেলিফোন করলে!

অরুণাভ লজ্জা পেয়ে বলেছিল, সত্যি . . . আর বলো কেন . . . আমরা সবাই বোধহয় বড্ড প্র্যাক্টিক্যাল হয়ে উঠেছি। সেটা তো ভালই . . . তবে সঙ্গে একটু আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকলেও বেশ লাগে।

হ্যাঁ বউদি . . . ঠিক বলেছো। আমরা বড় স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি দিনেদিনে।

স্বার্থচিন্তা সবাই করে অরুণ। তবে শুধু ওটুকুই এবং আর কিছু না ভাবলে . . . মানুষটা, মনটাও বোধহয় ছোট হয়ে যায়। আমরা দেশে . . . বোধহয় তেমনই হয়ে যাচ্ছি বউদি।

আরে না-না . . . আমি অভিযোগ করছি না . . . বললাম আর কী! হ্যাঁ কী বলছিলে . . . কবে কলকাতা . . .।

অরুনাভ বাধা দিয়ে বলেছিল, কেমন আছো বউদি?

সুদীপা হাসির মতো শব্দ করে বললেন, এখন আর জিগ্যেস করে কী হবে! তাছাড়া উত্তরটাও ওভারসিজ টেলিফোনে দেওয়ার মতো নয়। সে যাক। তোমার গলায় একটু ওয়ারিজ মনে হল . . . কী ব্যাপার বলো তো?

শ্রীরামপুরের বাড়ির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে বউদি।

নতুন কিছু ভাবছো তোমরা?

মাঝে মাঝেই এটাসেটা আলোচনা হয়েছে। দু-একবার দাদার সঙ্গেও কথা হয়েছিল ওই পর্যন্ত। কিন্তু এবার দাদা চলে যাওয়ার পরে . . . জয়া আর দীপকের প্রস্তাবে . . . কী বলব, আমি বড় টেনশনে পড়ে গেছি।

প্রস্তাবটা কী ওদের?

ওরা চায় পুরনো বাড়ি আর না রেখে, গ্যারাজ-বাগানের জমিটমি যা আছে . . . সব নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি করা হোক। জি প্লাস ফোর যদি করা যায়, তাহলে সবশুদ্ধ ষোলটা ফ্ল্যাট ভালভাবেই হতে পারে। দাদারও আপত্তি ছিল না এতে।

কতটা জমি বলো তো ওখানে?

প্রায় পাঁচ কাঠা বউদি . . . এক-এক ফ্লোরে আটশ করে চারখানা ফ্ল্যাট হতে পারে . . . কেউ ইচ্ছে করলে জোড়া লাগিয়ে বড় করতেও পারে। গঙ্গার কাছাকাছি বলে ডিমান্ডও আছে। আমরা দুটো করে ফ্ল্যাট আর কিছু ক্যাশ . . . কিংবা যার যেরকম দরবার . . .।

শুনে তো ঠিকই মনে হয়।

আমারও আপত্তি নেই বউদি . . . কেননা এখান থেকে রাজারহাট . . . আমার অফিস করাটা আর পোষাচ্ছে না।

তোমার টেনশনটা কী নিয়ে? প্রোমোটার পাওয়া যাচ্ছে না?

না-না-না প্রমোটার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জয়া-দীপক কোনো প্রোমোটারদের আসতে দিচ্ছে না। বলছে, ওরাই যা করবার করবে, এবং ওদের কাছেই আমাদের অংশ বিক্রি করতে হবে।

ওরা যদি টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশন ঠিক রাখে . . .।

সেখানেই তো কথা বউদি . . . ওরা যেসব টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশন করছে . . . কী আর বলব . . . অনেক কথা। দীপক তো আবার তৃণপার্টির কাউন্সিলের দাঁড়াবার চেষ্টা করছে . . . বলছে, কলেজ ছেড়ে দেবে . . . ওদের ইচ্ছেতেই আমাদের সাথ দেওয়ার জন্য প্রেশার ক্রিয়েট করছে.. ।

আর যদি সায় না দিই ?

তোমার কোনো অসুবিধে নেই . . . তোমার আর কী ! আমি এখনই নানান ডিফিকাল্টি ফেস করছি . . . তোমাদের বারান্দা আর বাথরুমের খানিকটা তো ওরা এমনিতেই ব্যবহার করছে . . . আমার মেয়ে, পাপিয়া . . . কেউই আর এখানে থাকতে চাইছে না . . . ।

দেওরের টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারটা মাথায় ঘুরেছিল সুদীপার।

বুঝেছিলেন, ননদ এবং লম্পট নন্দাই বেশ আটঘাট বেঁধে, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থনে শ্রীরামপুরে দাঁও মারার ব্যবস্থা করেছে। যথারীতি সেখানেও বড় সুবিধে যে, বাড়ির বড়দা প্রবাসে প্রয়াত এবং বউদি থেকেও নেই। বলা যায় না, দীপক এরপরে সুদীপাকেও আবার নতুন কোনও প্রস্তাব দেবে কিনা। লাথি খাওয়া কুকুর ফসকানো শিকারের গন্ধ ভোলে না !

পোশাক পরতে পরতে কাজের লিস্ট্ মাথার মধ্যে একবার ঝালিয়ে নিলেন সুদীপা।

প্রথমেই লয়েডস ব্যাংকে যাবেন। মর্টগেজ এ্যাডভাইসার লিন্ডা টুম্যানের সঙ্গে পৌনে বারোটায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। বেশ কিছুটা ক্যাশ ট্রান্সফার করে দেবেন, নতুন এ্যাকাউন্ট খোলা ন্যাটওয়েস্ট ব্যাংকে। লাঞ্চ টাইমে ঘন্টাখানেক টাউনে কেনাকাটা সেরে নেওয়াই ভাল। যদিও কয়েক মাস পরেই আবার কলকাতা যেতে হচ্ছে, তাহলেও টুকিটাকি কিছু কিনতে হবে। রূপাদের জন্য একটা করে কিছু . . . মাইতি একটা ছোট ক্যামেরার কথা বলেছিল বটে . . . কিন্তু . . . থাক দেখা যাবে। দোকানে ঘুরতে ঘুরতেই একটা স্যান্ডুইচ . . . তারপর কাউন্সিল-এর ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট্ সেরে ফ্ল্যাটগুলোর কাজ দেখতে . . . ।

ঠিক সাড়ে এগারটাতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সুদীপা।

গত মাসে মাইতির টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে, সুদীপা টের পাচ্ছিলেন, কোথায় যেন উৎকণ্ঠা আর বিভ্রান্তির মেশামিশি হয়ে যাচ্ছিল। এতো দূর থেকে সব কথার ব্যাখ্যা চাওয়া যায় না, অথচ কোথাও খটকা থেকে যায়। আবার আন্তরিকভাবে যে উপকার করছে, সে যাতে কোনো কথায় ক্ষুন্ন না হয় সেটাও মাথায় রাখতে হয়। রূপাও এটা-সেটা খোঁজখবর রাখে, মাঝেমধ্যে কথাবার্তাও হয়। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার বিষয় ও আর জানবে কোত্থেকে ! বরং ওকে বলা-ই আছে, ও-বাড়ি থেকে কোনো কাগজপত্র-চিঠি-নোটিস . . . কিছু পেলেই যেন মাইতির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মাইতি সেইসব লইয়ার অপূর্বরঞ্জনের কাছে নিয়ে যায় এবং আলোচনা করে। যাই হোক না কেন, নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে করে তো !

সেই যে বছর দুয়েক আগে মাইতির একটা হার্টএ্যাটাক আর এ্যাঞ্জিও প্লাস্টির সময়, রজতাভ তো বটেই, সুদীপাও ওকে নিয়ে ছোটা-ছুটি করেছিল, সেটা ও মনে রেখেছে। তাছাড়াও সম্পর্ক তো কত বছরের। বিপদ আপদ কম যায় নি মাইতির। আর আজ, সত্যি বলতে কি, মাইতি কলকাতায় না-থাকলে, কে সামলাতো এই বিরাট দায়িত্ব ! শুধু টাকাতেই এসব কাজ হয় না।

তাসত্ত্বেও অবশ্য সেদিন সকালে মাইতির গলা এবং জরুরী দরকার শুনে প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন সুদীপা। ঘুমতো সঙ্গে-সঙ্গেই কেটে গিয়েছিল। বলে উঠেছিলেন, কিরকম জরুরি মাইতি ! তোমার গলা এতো টেন্সড্ শোনাচ্ছে কেন ?

মাইতি বলেছিল, হ্যাঁ দীপাদি . . . এতো দিন আপনাকে বলতে চাইছিলাম না . . . অতদূর থেকে আপনি কী-ই করবেন . . . ! ব্যাপারটা কী হয়েছে ?

হয়েছে মানে . . . টুকটাক ঝামেলা ওরা তো করেই চলেছে আপনি যাওয়ার পর থেকে . . . ।

সেগুলো তুমি অপূর্ববাবুকে জানাচ্ছো তো ?

হ্যাঁ . . . হ্যাঁ . . . আমি ওনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি ।

আবার নতুন কিছু করেছে ?

শুনলে আপনার ব্রহ্মান্ড জ্বলে যাবে দীপাদি . . . কী বদমাইস ছেলে যে . . . এই অপুটা . . . ।

কী করেছে বলো . . . শুনতে তো হবেই আমাকে . . . ।

আপনি তো জানেনই ওরা মিথ্যে কথা বলে-বলে একের পর এক কেস্ করেই চলেছে ।

শুনেছিলাম . . . কিন্তু অপূর্ববাবু বলেছিলেন — ওগুলো নিয়ে না ভাবতে । ওসব টিকবে না ।

সে তো বটেই । কবে ওই . . . হ্যারাসমেন্ট । আর যাইহোক না কেন . . . কেস করলেই আমাদের তো কোর্টে এ্যাপিয়ার হতে হবে ।

সুদীপা দু-এক মুহূর্ত সময় নিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ . . . বুঝতে পারছি । এই দুমাসের মধ্যে সেরকম . . .

মাইতি দ্রুত বলল, আপনার মেইন কেস ছাড়া এরমধ্যে অপূর্বদাকে তিনচার বার তো এ্যাপিয়ার হতেই হয়েছে . . . উপায় কী !

তুমি ওনার ফিজ্-টিজ্ গুলো ঠিকমতো দিয়ে যাচ্ছো তো মাইতি ?

ওসব নিয়ে আপনি অতদূর থেকে ভাববেন না তো !

না-ভাবলেও মাথায় তো রাখতে হবে । একবার কোর্টে দাঁড়ালে ওঁর ফিজ্ কত মাইতি ?

খানিক ভ্যারি করে . . . এ্যাভারেজ সাত থেকে বারো হাজারের মধ্যে ।

তুমি হিসেব রেখো . . . আমি গিয়ে আবার . . . ।

ঠিক আছে দীপাদি . . . আপনি যে পঞ্চাশ দিয়ে গিয়েছিলেন . . . সব মিলিয়ে তার ওপর আরও কিছু লেগেছে . . . কিন্তু আমি সবই লিখে রেখেছি . . . আসলে লইয়ারের ফিস ছাড়াও তো এদিক ওদিক দিতে হয় . . . কোর্টের ও ফিজ আছে . . . ।

না-না তোমাকে ওসব আবার বলতে হবে না মাইতি । শুধু দেখো . . . ওরা যেন পার না পায় ।

সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকবেন ।

নতুন কি আর একটা ঝামেলা করেছে বলছিলে ?

হ্যাঁ । ওরা নিজেরাই জল-ইলেক্ট্রিসিটি কানেকশন খারাপ করে দিয়ে একটা ধুয়ো তুলেছে যা ওদের ওপর ইনহিউম্যান টর্চার করা হচ্ছে . . . এই নিয়ে পাড়াতেও গন্ডগোল করেছে . . . মাসিমাকেও ট্রাবল দিচ্ছে . . . আবার একটা কেস তো করছেই . . . ।

সুদীপার মনে হল সত্যি যেন তাঁর বুকের মধ্যে চিনচিন ব্যথা করছে এবং একইসঙ্গে ক্ষোভে দুরদুর করছে হৃদপিন্ড। মনে মনে ভাবলেন সত্যি সত্যি এতো মিথ্যাচার বলতে পারে ! সে কথাটাই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বললেন, এটা কি সম্ভব মাইতি ! ওরা যা-ইচ্ছে তাই বলে বলে আমাদের এমন বিপদে ফেলবে . . . আর আমরা চুপ করে থাকব না দীপাদি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে . . . ছ্যাঁচড়া লোকরা তো এটাই করে। একের পর এক ফলস্ কেস করে করে আপনাকে ফেড আপ করে দেবে . . . গাড্ডায় ফেলবে . . . আর সেই সুযোগে লইয়ারও যা পারবে কামিয়ে নেবে . . . আপনি না-পারবেন ফেলতে, না-পারবেন ওগরাতে . . . ।

আমাদের লইয়ার নিশ্চয়ই তেমন লোক নন . . . !

না দীপাদি . . . অপূর্বদাকে তো অনেকদিন ধরে দেখছি . . . গোবরেও তো দু-চারটে পদ্মফুল ফোটে ! উনি সেইরকম। ফুটলেই ভাল। কিন্তু ওই চামারগুলো মা কেও এই বয়সে কষ্ট দিচ্ছে . . . !

আমি গিয়েছিলাম মাসিমার কাছে। একটা ঠেকা দেওয়ার ব্যবস্থাও করে এসেছি। আসলে জল-ইলেক্ট্রিকের কেস দেখেই কোর্ট একটা অর্ডার ইশ্যু করেছিল। ওদের লইয়ারটা . . . সেই দেবকান্ত মিশ্র লোকটাও তো সাংঘাতিক প্যাঁচোয়াড় আর কোরাপটেড। সে আবার আপনার সোনাদি-জামাইবাবুর বন্ধু তো . . . !

সে চুলোয় যাক . . . কিন্তু ও বুনো ওল হলে, আমাদের লইয়ার বাঘা তেঁতুল হতে পারছেন না ! হচ্ছে দীপাদি, হচ্ছে . . . । এখানে . . . বোঝেন তো . . . কেস একটা করে দিলে . . . সেটা আনডু করতেও সময় লেগে যায়। এই তো অপূর্বদা আবার এ্যাপিয়ার করছেন পঁচিশ তারিখে . . . ।

ওদের এগেনষ্টে আমরা দু-চারটে কেস করতে পারিনা মাইতি ?

ইচ্ছে করলেই করা যায় . . . কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। এই যে এখন আমরা একটা কোর্টের গুডবুকে আছি . . . কেননা ওরা যে ফলস্ কেস করছে সেটা তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে . . . কিন্তু আমরাও তেমন করলে সেটা আর থাকব না। কিন্তু তাইতে কোনো লাভও হচ্ছে না মাইতি !

হচ্ছে দীপাদি হচ্ছে . . . । আসলে দেখুন, আমাদের ওরিজিনাল কেস্ তো এখনও পড়েই আছে। আপনি না থাকায় এ পর্যন্ত তিন-বার তো ডেফার করতেই হয়েছে। অপূর্বদা মাথা খাটিয়ে মক্কেল হিসেবে আপনাকে প্রোটেক্ট করেছে . . . এবার জাজ্-ও একটু চাপ দিচ্ছে। সামনের মাসেই আবার ডেট পড়বে মনে হচ্ছে।

কিন্তু . . . আমি তো তখনও . . . ।

দেখা যাক কী হয় . . . কবে ডেট পড়ে ! আমি আপনাকে জানাব . . . তারপর দেখুন . . . কী করতে পারেন। এক একবার কেস পিছোতে গেলে খরচও তো আছে ! এরমধ্যে ওরা তো আবার কিছু একটা ফলস্ কেস করতেই পারে . . . ।

সেইটাই কথা . . . । আমি এরমধ্যে একদিন ওদের লইয়ারকে বলেই ফেলেছিলাম . . . আবার কী প্যাঁচ কষছেন . . . ! ওদের লইয়ার !! তোমার কি ওদের লইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মাইতি !

আরে না-না . . . কী বলেন দীপাদি . . . আসলে কোর্টে যেতে যেতে . . . আলিপুরের সব লইয়ারের সঙ্গেই তো মুখ চেনাচিনি হয়ে যায় . . . আর এই দেবকান্তকে সব্বাই নোটোরিয়াস বলে জানে . . . । যত সব নেগেটিভ কেস করে লোকটা। সুদীপা আবার একটু সময় নিয়ে বললেন, শোনো মাইতি . . . তোমাকে একটা কথা বলছি। কিছু মনে কোরো না। না-না বলুন না . . . আপনাদের সঙ্গে কি মনে করা-করির সম্পর্ক !

তুমি যদি মনে করো . . . আর একটু বড় . . . একটু ঝানু উকিল দরকার . . . তাহলে কিন্তু হেজিটেট করো না। খরচের জন্য ভেবো না। . . . সে আমি জানি দীপাদি। তবে . . . ঠিক আছে . . . মনে রাখব। কিন্তু অপূর্বদাও আসলে ফিট লোক। সেই দেখলেন না . . . আপনার হাত ধরেছিল বলে, অপুকে কেমন ক্রিমিনাল কেস-এ রগড়েছিল . . . ! টাকা দিয়ে পার পেয়েছিল বটে . . . কিন্তু সে কেসটা তো এখনও ঝুলছে . . . । যাইহোক আমি এদিকে দেখছি . . . ।

আমার মনে হচ্ছে মাইতি . . . তোমায় আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই . . ।

দরকার হলে বলবো দীপাদি . . . । আমি আর একটা অন্য কথাও ভাবছিলাম . . . । মানে আপনি যদি . . . ।

কী . . . বলো ।

ওদের সঙ্গে কি ? একবার খোলাখুলি কথা বলা যেতে পারে ! অনেকদিন আগে আপনারাও তো ভেবেছিলেন . . .

ওদের সঙ্গে . . . মানে . . . এই অপু-সোনাদিদের সঙ্গে ?

ভাবছিলাম আর কি . . . কী চায় ওরা . . . !

ওরা কী চায়, তা কি আমাদের বুঝতে বাকি আছে মাইতি ! প্লেন এ্যান্ড সিম্পল — আমার বাড়ি ওরা মেরে দিতে চায়। ন্ না . . . একটা যদি কম্প্রোমাইজ করার মতো কিছু . . . আপনার এতো হ্যারাসমেন্ট যাচ্ছে . . . এখনও কদ্দিন চলবে . . . । আমি কিন্তু এসব চিন্তা করছি না . . . । সেই স্টেজ আর মোটেও নেই এখন ।

সে তো আমি জানি . . . তাও ভাবলাম . . . । আসলে শেষপর্যন্ত যদি আপনারা ও বাড়ি বেচেই দেন . . . রূপাদিও যদি এগ্রি করে মাসিমাকে নিয়ে আপনি কোন ও ভাল ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন . . . তারপর ওরা বুঝুক . . . কী করবে !

তুমি কি বলছো আমি সবটা ধরতে পারছি না মাইতি . . . । তুমি কি ওদের কাছেই আমার আর রূপার অংশ বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলছো ?

আমি কিছুই বলছি না দীপাদি . . . এগুলো সবই আসলে বিভিন্ন অপশনের ভাবনা আর কি . . . ! মামলা-মকদ্দমা-কোর্ট-লইয়ার-ছোটাছুটি-ঘুষঘাষ-পুলিশ . . . মস্তান-পলিটিক্স . . . আমাদের দেশে এসবের কী স্ট্রেস বলুন তো ! তারপর এ্যাট দি এন্ড অব দি ডে . . . আপনি যে জাস্টিস পাবেন তারই বা গ্যারেন্টি কোথায় বলুন . . . !

কিন্তু মাইতি . . . নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে তো হবে না . . . যেমন কুকুর তেমন মুগুর হতে হবে . . . ।

সে তো ঠিক আছে . . . আমরা এ্যাডিকুয়েট ব্যবস্থাও করেছি . . . তাহলেও বললাম আর কি . . . ! ঠিক আছে দীপাদি আপনি ভাববেন না . . . এদিকে আমি দেখছি । আপনি দেখুন . . . কতটা আর্লি আসতে পারেন । আপনার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরেও তো প্রবলেম শুরু হয়েছে শুনলাম . . . শুনেছেন কিছু ?

মাইতির সেদিনকার দীর্ঘ সময়ের কথোপকথনের মধ্যে শেষপর্যন্ত শ্রীরামপুরের উল্লেখ শুনে সত্যি সত্যিই বেশ খানিকটা আতান্তরে পড়ে গিয়েছিলেন সুদীপা। বলেছিলে, ও কথা আবার তোমায় কে বলল ?

আমি তো নানান জায়গায় ঘুরি দীপাদি । মাইতি বলেছিল । উত্তরপাড়ায় একটা কাজ করছিলাম . . . যাতায়াত করতে হচ্ছিল প্রায়ই . . . ওই তখনই আপনাদের কথা হতে হতেই . . . আপনাদের তো অনেকেই চেনে . . . ।

মাইতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন সুদীপা । বলেছিলেন, আমি কিছু শুনিনি মাইতি . . . শুনতে চাইও না । আট-ন মাসের মধ্যে আমার জীবনে একসঙ্গে এতোকিছু নিতে হয়েছে . . . আরও বেশি হলে হয়তো পেরে উঠব না ।

বটেই তো, বটেই তো . . . সত্যি তাই দীপাদি । যাইহোক বেশি ভাববেন না . . . কিছু একটা তো হবেই . . . । টেলিফোন ছেড়েও সেদিন আরও বেশ কিছুক্ষণ শুয়েছিলেন সুদীপা । মাইতি খবরাখবর দিয়েছিল অনেক । ও রকম কেউ একজন না থাকলে, তিনি সত্যি বোধহয় গত মার্চে এদেশে ফিরতেই পারতেন না । কে সামলাতো তাঁর হয়ে । টাকা দিয়ে তো সব কাজ হয় না । অবশ্য মাইতি যে আবার নতুন কিছু ভাবনা মাথায় ঢুকিয়েছিল সেটাও সত্যি কথা । সব মিলিয়ে সমস্যাগুলো কি আরও জটিল হয়েই যাচ্ছে না !

সুদীপা টের পেয়েছিলেন, তিনি যেন চাপা অস্থিরতার শিকার হয়ে চলেছেন দিনকে দিন এবং তার অধিকাংশই তাঁর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক, কলকাতার ঘরবাড়ি . . . এইসব কারণে এখানকার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ততা, দৌড়ঝাঁপ পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু পিছনে অহরহ উৎকণ্ঠা, বিপদে পড়া এবং প্রতারিত হওয়ার আশংকা নেই, যেটা কলকাতার জন্য হচ্ছে । দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন ঘরবাড়ির কাজকর্ম গুলো মোটামুটি গুছিয়ে নিলেন সুদীপা ।

কাউন্সিল, হেলথ, ডিপার্টমেন্ট . . . সবুজ সংকেত দিতে না দিতে টেনান্ট ও হাজির । পূর্ব য়্যুরোপ থেকে ইংল্যান্ডে লোক আসার বিরাম নেই । দেখতে দেখতে যাওয়ার দিনটাও এগিয়ে আসছে । সুদীপাকে সব থেকে বেশি মানসিক সমর্থন দিলেন রুথ ফিরে এসে । বললেন, তুমি নিশ্চিন্তে যাও . . . আমি তোমার ঘরবাড়ি-টেনান্ট-গার্ডেন . . . সব লক্ষ্য রাখব . . . বিদিশা তো আছেই . . . ।

আঠারই জুলাই কলকাতার প্লেন ধরতে গিয়ে সুদীপার মনে হল, এতো অশান্তি আর উদ্বেগ নিয়ে এর আগে তিনি কখনও দেশে রওনা হয়নি . . . এমনকি আগের রজতের মৃত্যু'র পরেও । . . .

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা । ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন । প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত । 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ২

একটু আগে বিকেল নামতে শুরু করেছে কলকাতা শহরের বুকে। সারাদিনের চড়া আলোয় দিনযাপনের অভিনয় শেষে যেন জীবন সিরিয়ালের আজকের এপিসোডের শেষ অংকে এসে পৌঁছেছে শহরটা।

সারা দিনের মধ্যে এই সময়টায় বড় অস্বস্তি লাগে নীলের। কেমন যেন শিরশিরে একটা ভাব শীতের কুয়াশার মতো ধীরে-ধীরে ঘিরে ধরে তার চেতনাকে। আসলে, গোধুলির কালচে কমলা রং কেমন যেন বিষন্নতা ছড়ায়, দেখেছে নীল। তার সঙ্গে কাকেদের শ্রান্ত কা-কা চেনা-অচেনা পাখিদের হইচই — কেমন যেন মনে হয় ভালো করে বোঝবার আগেই চলে গেল আরও একটা দিন। কংক্রীটের খাঁচামার্কা তার কলেজের মাঝখানটায় এক চিলতে ঘাসচটা সবুজ আছে। তারই একধার ঘেঁষে প্রতিদিনের মতোই বিষন্ন দিনান্তকে হৃদয়ে জড়াচ্ছিল নীল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল রুম নাম্বার সিক্সের সামনেটায় যেন একটু চাঞ্চল্য। লম্বা লম্বা পা ফেলে নীল ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো। একটা মেয়ে কাঁদছে। তাকে ঘিরে ক'জন। তার মধ্যে তার ক্লাসের অনেকের মুখ দেখতে পেল নীল — তিয়াসা, সুপর্ণা, রঞ্জন, চৈতালি, কৌশিক, জয়। আর মেয়েটিকে ঘেঁষে সুদীপ। মেয়েটিকেও চিনতে পেরেছে এবার — বন্দনা। সুদীপের প্রেমিকা।

নীলের খুব অবাক লাগল। সে বুঝতে পারল খুব বড় মাপের একটা কিছু ঘটে গেছে তাদের কলেজে যার সম্বন্ধে সে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। আসলে, আজ নীলের মনটা একটু অন্যরকম হয়ে আছে। আজ তার ঠাকুমার মৃত্যুদিবস। ঠাকুমাকে বড় ভালোবাসত নীল। এ' পৃথিবীতে যে ক'জন মানুষ তার হৃদয়ের কাছাকাছি তাদের মধ্যে ঠাকুমা একজন। মনটা এতই বিচলিত হয়েছিল আজ সকাল থেকে যে ক্লাস করতে একটুও ইচ্ছা করেনি নীলের। পড়াশুনা ও বন্ধুদের এড়াতে সারাদিন চুপচাপ বসেছিল লাইব্রেরী রুমে। লাইব্রেরিয়ান সন্তোষদার সঙ্গে নীলের খুব ভাব। নিয়মিত সিরিয়াস পাঠক বলে নীলকে আলাদা নজরে দেখে সন্তোষদা। সন্তোষদার থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''পুতুল নাচের ইতিকথা'' চেয়ে পড়ে শেষ করে সবে নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল নীল। তার মধ্যে এই কান্ড নীল কৌতুহল বোধ করল, বুঝতে চেষ্টা করল ওখানে কি হচ্ছে।

''সুদীপ, এই পার্টি আমরা করি রে ? এই পার্টি ? কোনও স্বাধীন মত প্রকাশ করা যাবে না ?'' — বন্দনাকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে শুনল নীল।

''কাঁদিস না বন্দনা, আমি ইউনিয়ান রুমে যাব। রঞ্জিতদাকে এর জবাব দিতে হবে।''

''কি হবে গিয়ে ? তোকে পাত্তাই দেবেনা শালারা। তার চেয়ে চল প্রিন্সিপালের কাছে যাই। ওনাকে বিচার করতে হবে এর। ওনার দায়িত্ব এটা।'' — তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে রঞ্জন।

এবার মুখ খোলে সুপর্ণা — ''না রে, তাতেও কিছু হবে না। প্রিন্সিপালের সাহস আছে পার্টির বিরুদ্ধে কিছু বলবার ? উনি কিছুই করতে পারবেন না, করবেন না।''

''তাহলে কি চুপ করে বসে থাকবো ? বন্দনার অপমান সহ্য করব চোখ বুজে ?'' — রঞ্জন উত্তেজিত আঙুল তোলে।

''তাছাড়া কিন্তু সত্যিই উপায় নেই রঞ্জন। ওদের বিরুদ্ধে গিয়ে টেঁকা যাবে না কলেজে। দেখিস না ইলেকশন-ই করতে দেয়না। বন্দনা, দুঃখ করিস না, মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই রে'' — চৈতালি হাত রাখে পিঠে।

বন্দনা মাথা নীচু করে নাড়ায় শুধু একটু। অস্ফুটে বলে, ''বেশ।''

''কি হয়েছে?'' — স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় কৌতুহল প্রকাশ করেই ফেলে নীল, রঞ্জনকে।

''আরে, রোজের মত আজও পার্টির ছেলেরা ক্লাসে ঢুকে কেন্দ্রের নতুন পদক্ষেপকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিচ্ছিল। বলা হলে রোজের মত বলল, ''কেউ কি কিছু বলতে চাও? বন্দনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কিছু বলার আছে। আমার মনে হয় যে পার্টির এই নীতিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত ভুল ও সংকীর্ণ। এর ফল পার্টি ও দেশকে ভুগতে হতে পারে।'' তখন রঞ্জিত দা বলল, ''কমরেড, এখানে এ'সব বলছ কেন? ইউনিয়ান রুমে এস। এমন করে প্রকাশ্যে তুমি বলতে পারো না। এটা পার্টির নীতির বিরুদ্ধে।'' তখন বন্দনা বলল, ''কেন, এ আলোচনা তো সবার সামনেই হওয়া উচিত।'' এই নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতে রঞ্জিত দা ওর বাঁ গালে সপাটে চড় মারল, তারপর 'বিচ্' বলল। তারপর ওরা বেরিয়ে গেল।''

— ''আর এরা বলছে, এটার নাকি কোনও প্রতিবাদ করা যাবেনা। কোনও বিচার নাকি হবেনা এর'' — রঞ্জন ফুঁসে ওঠে।

— ''কি করব বল?'' সুপর্ণা বলে নীলের দিকে তাকিয়ে, ''তুইই বল নীল, কিছু করাবার আছে?''

ঘটনাটা শুনে নীল অবাক হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন হল সারাদেশে কেন্দ্রের নতুন নীতি নিয়ে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে বটে, কিন্তু এমন কিছু দলের সমর্থনে যাদের মধ্যে আদর্শগত কোনও মিল নেই। ফলে ইতিমধ্যেই মধুচন্দ্রিমার পালা শেষ, খোঁড়ানো শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তাই আস্তাকুঁড় থেকে তুলে আনা হয়েছে এমন এক নীতি যার রূপায়ণে আগুন জ্বলতে পারে দেশজুড়ে। সরকার সেটা জানে এবং চায় বলেই মনে হয়েছে নীলের। সমাজের আড়াআড়ি বিভাজন হয় হোক, ভোট বাজারে দর ধরে রাখা বড় বালাই আজকের রাজনীতির কারবারীদের কাছে। তাছাড়া আগের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ধুয়ো তুলে ক্ষমতায় এসেছে এই সরকার, অথচ কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। তাই জনগণের নজর অন্যদিকে ঘোরানোও খুব জরুরী নীল এ'সব বোঝে। সে রাজনীতি করেনা বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ভালো লাগে তার।

— ''ও কি বলবে? ও কোনও কিছুতে থাকে? ওর তো ক্লাসের বাইরে একটাই আস্তানা, লাইব্রেরীর কোণটা। আমি সুদীপের থেকে জানতে চাই। বন্দনার ব্যাপারে সে বলুক'' — রঞ্জনের ঝাঁঝ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুদীপের প্রেমিক সত্ত্বা আর রাজনৈতিক সত্ত্বা তাকে মস্ত দ্বিধায় ফেলে দেয়। — ''হ্যাঁ, মানে ঠিকই, কিন্তু, সত্যিই কি কিচ্ছু.....'' , সুদীপ কথা হাতড়াতে থাকে। ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে গুণগুণ করে মত বিনিময় শুরু করে দেয়।

— ''কি রে চুপ করে আছিস কেন সুদীপ? বল।'' রঞ্জন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আবার। ''তুই কি বলতে চাস, তেমন কিছু করবার নেই?''

''হ্যাঁ, করবার আছে'' — আচম্বিতে ঘোষণার মতো অমোঘ লাগে নীলের কণ্ঠস্বর। সবাই একটু নড়ে-চড়ে ওঠে। নীল সেন কথা বলছে। সব সময় নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা ছ'ফুট লম্বা হাই পাওয়ার চশমার আচ্ছাদনে ভাসা-ভাসা চোখ ও একমাথা কোঁকড়া চুলের নীল বলছে। নীল সেন। পার্ট ওয়ান অন্য কোনও কলেজ থেকে পাস করবার পরে পার্ট টু মানে থার্ড ইয়ারে সে রঞ্জনদের কলেজে যোগ দিয়েছে। আজ পর্যন্ত পড়ার বাইরে যাকে কোনও ব্যাপারেই থাকতে দেখেনি কেউ। এমনকি ক'দিন আগের কলেজ সোশ্যালেও যায়নি সে। ঠিকই বলেছে রঞ্জন, মাঝে-মাঝে মনে হয় ক্লাসরুম আর লাইব্রেরী বাদে কলেজের আর কিছুই চেনেনা নীল, এমনকি ক্যান্টিনটাও নয়। কাজেই তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা অবাক করে সবাইকে।

— ''কি?'' — ডাকাবুকো রঞ্জনের গলাটাও অন্যরকম শোনায় বিস্ময়মাখা কৌতূহলে।

— আমরা এর প্রতিবাদ করব। এত বড় একটা অন্যায়কে মেনে নেওয়া অত্যন্ত অনুচিত। পার্টির কাছে প্রতিবাদে যদি সুবিধা না হয়, প্রিন্সিপালের কাছে আর্জিতে যদি সুবিধা না হয়, আমরা করব। বন্দনা আমাদের সহপাঠিনী। তার জন্য এইটুকু করা উচিত আমাদের। কিন্তু একটা কথা শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো। এ প্রতিবাদ হবে অরাজনৈতিক, রংবিহীন। একই সঙ্গে প্রয়োজন লাগাতার আন্দোলন যতক্ষণ না রঞ্জিতদা ক্ষমা চাইবে বন্দনার কাছে এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই'' — কথাগুলো অত্যন্ত শান্ত ও স্পষ্ট শোনায় নীলের গলায়।

— ''কিন্তু, আমরা কি করব রে নীল ?'' — তিয়াসা নীলের পাশে এসে দাঁড়ায়। — ''আমাদের কলেজ শুরু হয় সকাল এগারোটায়। আমরা সবাই সকাল দশটা-সওয়া দশটার মধ্যে কলেজের গেটে হাজির হয়ে যাব। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে শান্তভাবে জানাবো আজ কি ঘটেছে, দরকারে আমি একটা লিফলেট ছাপিয়ে আনব। প্রত্যেককে আমরা অনুরোধ করব এর প্রতিকার না হওয়া অবধি যেন কাল তারা একটাও ক্লাস না করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আসুক, পার্টির ছেলেরা আসুক, আমাদের মাথা যেন ঠান্ডা থাকে। কোনও প্ররোচনায় পা দেবনা আমরা। মারলে মারবে, তবুও। সুদীপ, তোর পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতা আমি বুঝি। তোর মনে হলে না ও থাকতে পারিস এটার মধ্যে। বন্দনা বা আমরা কেউই তোকে ভুল বুঝবনা।''

— ''না, না, থাকব আমি'' — সুদীপ মাথা ওঠায়।

— ''হ্যাঁ, আমরা সবাই থাকব, সবাই'' — বলে ওঠে অন্যরা।

— ''ভালো, কাল তাহলে দেখা হবে সকাল দশটায়, কলেজ গেটে'' — নীল বলে।

— ''জিও বস্। তুমি তো গুরু ছাইচাপা আগুন।'' — রঞ্জন নীলের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়।

নীল ক্লাসে ফিরে ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে গেটের দিকে এগোয়।

— ''এ্যাই, শোন্।

— নীল পিছনে ফেরে। জয়। এই জয়কে ভারী আশ্চর্য আর ভালো লাগে নীলের। ছেলেটা একদম অন্যরকম। বেশ অনিয়মিত ক্লাসে আসে জয়। নানা বিষয়ে কথা বলতে পারে, বোঝাই যায় এই বয়সেই সে অনেক পড়াশুনা করে ফেলেছে। একদিন তিয়াসার সঙ্গে ভারতনাট্যম নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ আলোচনা করতে শুনেছে নীল। অবাক হয়েছে। তিয়াসার মতো নামকরা নৃত্যশিল্পী কিন্তু বেশ মন দিয়ে জয়ের কথা শুনছিল। মাঝে ক্লাসেই ভ্রাটিয়ালি গেয়ে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠে। জয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার একটা চাপা ইচ্ছা আছে নীলের। অন্যরকম মনের মানুষদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে তার।

— ''তুই তো বেশ কামাল করলি রে আজ। চমকে দিয়েছিস সবাইকে। বাঃ। বেশ ভালো লাগল। হাত মেলা তো দেখি একবার।'' — জয়, একগাল হেসে বলে। চমৎকার একটা গজদাঁত আছে জয়ের। তাতে তার হাসি আরও ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

মৃদু হেসে জয়ের হাতটাকে ধরে চাপ দেয় নীল। তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে শেষ বিকেল ভেদ করে কলেজের বাইরে পা বাড়ায় সে।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৩

[**পূর্ব কথাঃ** *বেলা এগারোটা নাগাদ চা-ঘরের সামনে একটা বাইক থেকে দুজন অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে নামল। তাদেরকে বেশ একটু সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বাইরের চেয়ারে বসে চা-খাবারের অর্ডার দিল। মেয়েটা দোকানের ভিতরে টয়লেটে গেল। একটুক্ষণের মধ্যেই একটা জীপে করে একদল লোক এসে ছেলেটার উপর চড়াও হল! ওদের অভিযোগ, ওদের মেয়েকে এই ছেলেটি ফুসলিয়ে বার করে এনেছে! জিতেন দাস কোনোক্রমে মারপিট আটকালো। রঘুর উপস্থিত বুদ্ধির কারণে মেয়েটিকে যখন ওরা খুঁজেই পেল না, তখন নিরাশ হয়ে সবাই ফিরে যেতে বাধ্য হল। ছেলে মেয়ে দুটো এ যাত্রা বেঁচে গেল।*]

সকাল বেলাতেই চা-ঘরে এসে ডাক দিলেন বীরেশ্বর মল্লিক – 'রঘু, এক কাপ চা দে!'

ভিতর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে এল রঘু – 'মাস্টার মশাই, এত সকালে ?'

হাসলেন বীরেশ্বর – 'হ্যাঁ রে, বেরিয়ে পড়লাম ! কাল বিকেলে ঝড় বৃষ্টির পর আজ সকালে এমন সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে যে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না !'

মুরারী মুখ বাড়িয়ে বলল – 'এবার অনেক দিন বাদে এলেন মাস্টার মশাই!'

মাথা নাড়লেন বীরেশ্বর। ধীরে ধীরে বললেন – 'হ্যাঁ, আজকাল তোদের মাসীমার শরীরটা তেমন ভালো থাকে না। বিশেষতঃ সকালের দিকটায় উঠতেই পারে না! তাই সকালে আমাকে একটু সামাল দিতে হয়! কিন্তু কাল উত্তরপাড়া থেকে মাসীমার বোন এসেছে। তাই আজ আমি একটু ছুটি পেয়েছি!' কথা থামিয়ে মুখ তুলে সবার দিকে তাকিয়ে বেশ একখানা দরাজ হাসি হাসলেন বীরেশ্বর। দোকানের সামনে খোলা জায়গায় একটা টেবিলে অখিল ঘোষ আর বাসুদেব নন্দী মুখোমুখি চা নিয়ে বসেছিল। এরা দুজনে চা-ঘরের নিয়মিত খরিদ্দার। দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত। প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরবার সময় রোজই ওনারা মুরারীর হাতে বানানো এককাপ চা খেয়ে যান। বীরেশ্বরকে আসতে দেখে দুজনে ডাকলেন – 'আসুন আসুন, এদিকে আসুন। কতদিন পরে দেখা!'

বীরেশ্বর মল্লিক ওনাদের পাশে গিয়ে বসলেন।

এটা ওটা দু'চার কথার মধ্যেই অখিল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন – 'আপনার প্রতিবেশী, রাসুবাবুর খবর কি?'

আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়েই বীরেশ্বর উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন – 'রাসবিহারী বাবু ? কেন ? কি হয়েছে ওনার ? কদিন আগেই তো কথা হল। দেখলাম, বাড়ি রঙ করাচ্ছেন!' অখিল আর বাসুদেব অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দুজনেই মিচকি মিচকি হাসছেন। বীরেশ্বর কিছুই বুঝতে না পেরে দুজনের মুখ দেখছেন। অবশেষে বাসুদেব মুখ খুললেন – 'মাস্টারমশাই কিছুই জানেন না। অখিল একটু খুলে বল।'

অখিল ঘোষ আর ভণিতা না করে সোজাসুজি বললেন – 'রাসুবাবু সাংসারিক কারণে এতদিন বিয়ে করতে পারেননি, সেকথা জানেন তো ?'

– 'জানি বৈকি, সবই তো জানি! কম বয়সে বাবা মারা গেছেন। তারপর, ভাইদের মানুষ করা, বোনের বিয়ে দেওয়া! ছোট্ট একটা ব্যবসাকে অত বড় বানানো, সব করেছেন উনি! চাট্টিখানি কথা তো নয়! বিয়ে করার সময়ই পেলেন না!'

– 'এবার পেয়েছেন।'

বাসুদেবের কথায় চমকে প্রশ্ন করলেন বীরেশ্বর – 'তার মানে ?'

– 'তার মানে, এবার উনি বিয়ে করবেন মনস্থ করেছেন!'

– 'ও তাই? এখবরটা অবশ্য জানতাম না। তা বেশ বেশ!' একটু যেন বিব্রত ভাবে বললেন বীরেশ্বর – 'বয়সটা অবশ্য একটু বেশি হয়ে গেছে। ষাটের কাছাকাছি তো হবেই! তা হোক, এ বয়সেই তো সঙ্গী বেশি দরকার। বয়স্কা মহিলারাও আজকাল অনেকেই এরকম প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান!'

– 'ওইখানেই তো মুস্কিল। উনি মোটেই বয়স্কা মহিলা চান না! উনি বলেছেন, কনের বয়স কুড়ির উপরে হতে পারবে না!' কথাটা বলেই অখিল বাবু হাসতে লাগলেন। বাসুদেব নন্দী মুখটা এগিয়ে এনে বললেন – 'ভাইপো, ভাগ্নেরা বলেছিল, তুমি বিয়ে করতে চাও, ভালো কথা! আমরা বউ খুঁজে এনে দেব!' কিন্তু রাসুবাবুর এক কথা, বউ-এর বয়স কুড়ির বেশী হওয়া চলবে না। বলছেন, 'আমার অনেক টাকা পয়সা আছে। শাড়ি গয়নায় মুড়ে রেখে দেব বউকে। কিন্তু কচি মেয়েই চাই!'

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বীরেশ্বর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অখিলবাবু বলে উঠলেন – 'কানাঘুষোয় শুনছি উনি নাকি এই কালীচকেই একটি মনের মতন মেয়ে পেয়ে গেছেন। মেয়েটা এখনো স্কুলে পড়ে!'

বীরেশ্বর মাস্টার উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন – 'অ্যাঁ! স্কুলে পড়ে? সে তো বাচ্চা মেয়ে! মেয়েটা রাজী হয়েছে?'

অখিল বাবু মাথা নাড়লেন – 'কি জানি, অত তো জানি না। তবে শুনেছি মেয়েটা নাকি ইদানীং রাসুবাবুর বাড়িতে আসা যাওয়া করছে!'

বেলা বাড়ছিল। বাসুদেব নন্দী আর অখিল ঘোষ মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

চায়ের কাপটা হাতে ধরে চুপ করে বসে রইলেন বীরেশ্বর! মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। মেয়ের কথা মনে পড়ল তাঁর। ওই একটিই সন্তান তাঁদের। অনেক কাল আগে বিয়ে হয়ে গেছে। নাতির বয়সই তো পনেরো পার হয়ে গেছে। জব্বলপুরে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি। সংসারের দায় দায়িত্ব সামলে অতদূর থেকে বাপের বাড়ি আসে কালে ভদ্রে। হঠাৎ কেন যেন এখন সেই ছোটবেলার মত মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে বড্ড ইচ্ছে করছিল। কাপের তলানি চা-টুকু ঢক করে গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার আগে রঘুকে ডাক দিয়ে বললেন – 'আজ একটু তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করিস!'

রঘু সেদিন বিকেলে মাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়েছিল। পড়াশোনার পর ওনার বাড়ি থেকে বেরোতেই বকুলের সাথে দেখা হয়ে গেল। বকুল জিজ্ঞাসা করল – 'কিরে পড়তে এসেছিলি?'

- 'হ্যাঁ! তুই এদিকে কোথায় এসেছিলি?'

প্রশ্নের উত্তরে বকুল একটু আস্তে করে বলল – 'রাসুবাবুর বাড়িতে এসেছিলাম!'

রঘুর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল। কথা না বলে একবার বকুলের দিকে তাকাল। ইদানীং বকুলের চেহারাটা যেন আরো খুলেছে ! শেষ বিকেলের আলোতে ওর ফর্সা গায়ের রঙ গলানো সোনার মত দেখাচ্ছে! ওর চোখের তারা চঞ্চল, আর চুল লালচে। ভ্রূ ভঙ্গিতে আর ঠোঁটের কোনায় যেন একটা অহংকারী ভাব! চেহারায় চটক আছে! আজকাল বকুল বেশ সাজতেও শিখেছে। বোধহয় মাঝেসাঝে পার্লারে যায়। এখন যে সালোয়ার স্যুটটা পরে আছে, সেটা বেশ দামী বলে মনে হচ্ছে। রঘুর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি ঘুরপাক খেতে লাগল। বকুল এত টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে ? যশোদা মাসীর তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তার মধ্যেই তো কত কষ্ট করে বকুলকে পড়াচ্ছে !

ওরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছিল। বকুল বলল – 'অনেক দিন আমাদের ওদিকে আসিসনি। মা তোর কথা বলছিল। একবার দেখা করতে যাস !'

রঘু থেমে গেল। হঠাৎ বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বলল – 'তুই আর রাসুবাবুর বাড়ি যাস না বকুল। উনি বাড়িতে একলা থাকেন, শুনেছি লোক তেমন সুবিধের নন। লোকেরা তোকে নিয়ে নানা কথা বলছে। কি দরকার তোর ওখানে যাবার ? কে জানে কখন কি সর্বনাশ করে দেবে তোর!'

এবার হো হো করে হেসে উঠলো বকুল। পড়ন্ত সূর্যের আলোতে ওর সাদা দাঁতের পাটি ঝিলিক দিয়ে উঠল। হাসির দমকে ওর তরতাজা যৌবন বিপজ্জনক ভাবে ছল্‌কে উঠল। রঘু চোখদুটো ফেরাতে পারল না। কিন্তু মনের কষ্টটা রয়েই গেল।

হাসতে হাসতেই বকুল বলল – 'লোকের কথা বাদ দে। আর রাসুবাবুর কথা বলছিলি, চিন্তা করিস না। লোকটা জলঢোড়া সাপ। বিষ নেই!'

রঘু অবাক চোখে বকুলের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কাকে দেখছে সে? এ কি তার সেই ছোট বেলার বন্ধু, নাকি অচেনা কোনো রহস্যময়ী নারী!

বড় রাস্তার মুখে এসে বকুল দাঁড়ালো। রঘুর দিকে তাকিয়ে বলল – 'রঘু, তুই আমার ছোট বেলাকার বন্ধু। খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু এখন আর তুই আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস না! মাস্টারমশাই, আলোদিদি, সবাই বলে যে তোর খুব বুদ্ধি! তুই বরং মন দিয়ে পড়াশোনা কর। হয়তো লেখাপড়া শিখেই তুই একদিন অনেক বড় হবি। আমার তোর মত অত মাথা নেই। পড়াশোনা করতে ভালোও লাগছে না। আমি আমার পথ ঠিক করে নিয়েছি!'

রঘু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল – 'কি ঠিক করেছিস তুই?'

হাসি হাসি মুখে বকুল বলল – 'কাউকে বলবিনা তো ? দিব্যি খা!'

রঘুর চোখ দুটো বকুলের মুখের উপর স্থির হয়ে আছে। মাথা নেড়ে বলল – 'না, বলব না !'

বকুল গলা নামিয়ে গোপন কথা জানাল – 'আমি মডেলিং করব। রিকুদা বলেছে সব ব্যবস্থা করে দেবে!'

– 'রিকুদা কে?'

– 'তুই চিনবি না। স্টুডিও পাড়ায় অনেকের সাথে চেনা জানা আছে ওর। পুরো নাম রাকেশ সিনহা। সবাই রিকু বলে ডাকে। জানিস তো, ও বলছিল, আমার চেহারাটা নাকি মডেলিং-এর জন্য একেবারে আইডিয়াল!'

রঘু হাঁ করে বকুলের কথা শুনছিল, কিন্তু কিছুই যেন ঠিক করে বুঝতে পারছিল না। এটা কোন বকুল? কি সব বলছে ও? রঘু প্রশ্ন করল – 'এসব কথা যশোদা মাসী জানে?'

বকুল প্রায় লাফিয়ে উঠল – 'পাগল নাকি ? মা জানতে পারলে সব ভেস্তে যাবে। খবরদার, মা'র কানে যেন না যায় !

আমি ছোট বাচ্চাদের টিউশন পড়ানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ! আগে একটা ঠিক ঠাক কাজ পাই! তখন মা'র হাতে টাকা দিয়ে সব জানাবো।' একটু থেমে চিন্তিত মুখে বকুল বলে চলে – 'আসলে এই লাইনে ঢুকতে গেলে প্রথমেই সাজপোশাক, বিউটি-পার্লার, ফটো তোলা – এসবের জন্য বেশ কিছু টাকা দরকার হয়!'

এরপর রঘুর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল – 'সেই জন্যই তো বুড়ো রাসু সরকারের সাথে ভাব করেছি!' হঠাৎই ব্যস্তভাবে বলে ওঠে সে – 'অনেক দেরী হয়ে গেল। তোর আমার পথ এবার আলাদা। তুই ওদিকে যা। আমিও চলি।'

চা-ঘরে ফিরতেই, দেরী করার জন্য মুরারীর কাছে রঘু খুব একচোট বকুনি খেল। দোকানে খরিদ্দার অনেক। বাইরে ভিতরে সব চেয়ার ভর্তি। একটু আগেই দু'গাড়ি ভরা লোক এসেছে। চা আর পকোড়ার অর্ডার দিয়েছে। রঘু বুঝল, জিতেন দাসের বকুনিটা তোলা রয়েছে। ওটা পরে হবে। বকুলের কথায় মনের মধ্যে যে ধোঁয়াটে ভাবটা তৈরী হয়েছিল, কাজের ধাক্কায় সেটা উড়ে গেল। কিন্তু ফিরে এল আবার রাতে বিছানায় শোবার পর। বকুলের জন্য একই সাথে বুকের মধ্যে কষ্ট আর ভয় জমে উঠল। মনে হল, বকুল ঠিক করছে না। কিছু একটা করা দরকার! অথচ কি করে কি করবে বুঝতে পারছিল না। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল সে। তবু সারাদিনের ক্লান্তি তাকে একসময় ঘুম পাড়িয়ে দিল। রাসুবাবু চা-ঘরের নিয়মিত খরিদ্দার নন। কিন্তু মাঝে মাঝে আসেন। আজকাল চুলে কালো রঙ লাগিয়ে, লাল নীল হলুদ সবুজ ইত্যাদি রকমারী টি-শার্ট পরে সন্ধ্যার সময় আসেন, দোকানে বসে চা খান। চেনা জানা, পাড়া প্রতিবেশী কেউ না কেউ থাকেই ! তারা টিকা টিপ্পনি কেটে রাসুবাবুর সাথে কথা বলে, ওনাকে নিয়ে মজা করে। আসলে ওনার গোপন প্রেমের গল্পটা এখন আর মোটেও গোপন নেই। কালিচকে ওটা এখন একটা রসালো আলোচনার বিষয়।

সেদিন গোপেন বাবু বলল – 'কি ব্যাপার রাসুদা, আপনার বয়সটা যে ক্রমশই কমে যাচ্ছে?'

আরেক জন বলল – 'সত্যি কিন্তু! মনে হচ্ছে এক লাফে পঁচিশ বছর কমিয়ে ফেলেছেন। কি খাচ্ছেন বলুনতো? কোনও টোটকা টাটকি করছেন নাকি?'

রাসুবাবু এসব শুনে খুশী হন। নতুন প্রেমিকের মত আলহাদ আর লজ্জায় মাখামাখি মুখটা একটু লালচে দেখায়। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলেন – 'না না, টোটকা কিছু নয়। ছানা, ডিম এসবের সাথে নিয়মিত কাজু-টাজুও একটু খাচ্ছি। শরীরটা ঠিক রাখা দরকার। বল থাকা চাই তো?'

উপস্থিত সবাই চোখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসে। একজোটে জোর দিয়ে বলে – 'অবশ্যই অবশ্যই। বল কম হলে কি করে চলবে?'

আর একদিন একজন বলল – 'বাড়ি তো রঙ টঙ করে একেবারে চকাচক করে ফেলেছেন। মনে হচ্ছে শিগগিরই সানাই বাজবে। কার বিয়ে কাকা ?'

উত্তর না দিয়ে মিচকি মিচকি হাসতে লাগলেন রাসুবাবু। ঘাড় দুলিয়ে বেশ রহস্য করে বলেন – এত ব্যস্ততা কিসের ? সময়মত সবই জানতে পারবে !'

এর কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা বকুল ওর ভাই সঞ্জুর হাত ধরে চা-ঘরে এল। বড় এক ঠোঙা পকোড়া কিনে ভাইয়ের হাতে দিতেই খুশিতে ভরে গেল সঞ্জুর মুখ। রঘুকে একপাশে ডেকে নিয়ে বকুল বলল – 'কেমন আছিস রঘু? আলোদিদি তোর খুব প্রশংসা করছিলেন। আমি জানি পরীক্ষায় তুই দারুণ ভালো সব নম্বর পাবি !'

রঘু একটু হেসে বলে – 'পরীক্ষা এখনো দেরী আছে। তুই এত আগেই সব জেনে গেলি?'

– 'জানাজানির কি আছে? মনে হল তাই বললাম। ভালো করে পড়াশোনা করিস। ভালো থাকিস!'

বকুল আর দাঁড়ালোনা। ভাইয়ের হাত ধরে চলে গেল। রঘু একটু অবাক হয়ে ভাবছিল – বকুল আজ যেন কেমন কেমন কথা বলল !

বিল্টু পাশে এসে রঘুর কাঁধে হাত রেখে বলল – 'মেয়েটা জব্বর দেখতে। একেবারে ভেপার-ল্যাম্প। যেমন জৌলুস তেমন তাপ! কিন্তু রঘু একটা কথা বলি। ও মেয়ের সাথে না ভিড়লেই ভালো। মেয়েটা একটু ছেনাল আছে!'

রঘুর মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। রাগে চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠলো। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে বিল্টু একটু থমকে গেল। তারপর শান্তভাবে বলল – 'আমি তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তোর ভালোর জন্যই বলছি রঘু। আমি জানি ওই মেয়েটা তোর বন্ধু। কিন্তু ওর জন্য তোর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেইজন্যই তোকে কতগুলো কথা বলতে চাই!'

রঘু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞেস করল – 'কি কথা ?'

চট করে একবার এদিকে ওদিক দেখে নিয়ে বিল্টু বলল – 'দ্যাখ, এখন কাজের সময়। বেশি কথা বলার সময় নেই। এইটুকু তো জানিস, মেয়েটা যখন তখন রাসু সরকারের বাড়ি যায় !'

– 'তাতে কি হয়েছে?' বাধা দিয়ে রঘু বলে – 'একজন বয়স্ক মানুষ। একা থাকে। তাকে যদি কখনও সখনো এক কাপ চা বানিয়ে দেয় বা কিছু রান্নাবাড়া করে একটু সেবা যত্ন করে, তো এতে খারাপ কি আছে ?'

ঠাট্টার হাসি হেসে বিল্টু বলে – 'কিন্তু ব্যাপারটা যে এরকম নয়, সেটা তুইও জানিস। শুনেছি, দুমাস পরে রাসু সরকারের সাথে ওর বিয়ে হবে !'

চমকে উঠল রঘু – 'বিয়ে ? দুমাস পরে ?'

রঘুর চোখে চোখ রেখে বিল্টু বলে – 'হ্যাঁ। দুমাস পরে। কারণ তখন মেয়েটার আঠেরো বছর পুরো হবে। আঠারোর আগে তো বিয়ে করতে পারে না। পুলিশে ধরতে পারে। তাই দু মাস পরেই বিয়ে। রাসুবাবু তো আলহাদে আটখানা হয়ে আছে! বিপিন বাবুকে নাকি বলেছেন, বউ যাতে অন্য কারো দিকে নজর না দিতে পারে, তার জন্য শাড়ি গয়না দিয়ে ভুলিয়ে তাকে সারাক্ষণ তালা চাবি দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে দেবেন!'

বিল্টুর কথা শুনে রঘুর খুবই দুশ্চিন্তা হতে লাগল। ও ঠিক করল, খুব শিগ্‌গিরই বকুলের সাথে কথা বলতে হবে। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে, নিজের জীবনটা যাতে এভাবে নষ্ট না করে !

পরদিন বিকেলের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ! 'বকুল পালিয়েছে, রিকুর সাথে ! ওরই বাইকে চেপে বকুল কালিচক ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, কেউ জানে না। ওর মা-ও জানে না !'

ঘটনাটা জানবার পর থেকে বকুলের মা, যশোদা আছাড়ি পিছাড়ি করে কেঁদেই চলেছে। আর অন্য দিকে রাসু সরকার কখনও কপাল চাপড়ে হায় হায় করছে, আবার কখনও দারুণ রাগে তড়পাচ্ছে, 'ছাড়বো না। এত সহজে বকুলকে আমি ছাড়বো না। যেখান থেকে হোক ঠিক ধরে আনবো। আমাকে ধোঁকা দেওয়া ? এর শাস্তি আমি দেবোই দেবো। ওর পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, সব একেবারে কড়ায়-গন্ডায় উসুল করে নেব !'

চা-ঘরে তখন পকোড়ার যোগান দিতে দিতে রঘু ভাবছিল – 'বকুলের ভাগ্যে কি আছে কে জানে ! ওর মডেল হবার স্বপ্নটা শেষ পর্যন্ত সত্যি হবে তো ?'

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

ভৌতিক

পর্ব ৭

ভুতে আমার ভারি ভয়। দিনে দুটো করে scientific journal ঘাঁটলেও যা কিছু বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত, ভুতানুমানের সামনে তারা একেবারেই আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখে মিডল উইকেট স্টাম্পড হয়ে ক্লিন বোল্ড হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, ভুতানুমান কথাটা আমার ইনভেনশান বলতে পারেন যার অর্থ হল ভুতের অনুমান অর্থাৎ কিনা "আশেপাশে কোথাও অশরীরী কেউ নির্ঘাত আছে" – এই অনুভূতি, ইংরেজিতে যাকে বলে spooky feeling। ভুতেদের এই একটা বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মত দলভারি করতে চায় তারা হামেশাই। আপনাকে নিজের দলভুক্ত করতে আপনার জীবন নিয়ে টানাটানি করবে নির্জীব ভুতেদের দল। বাড়ি ভর্তি যখন লোক তখন টুঁ শব্দটি করবে না। বাড়িতে যে তেনারা আছেন টেরই পাওয়া যাবে না। যেন হাওয়ার সাথে মিশে থাকবে। যেই সকলে বেরিয়ে গেছে, পুরো বাড়িতে আপনি একা, তখনই স্বমুর্তি ধারণ করবে। স্বমুর্তি কথাটা হয়তো এই প্রসঙ্গে বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কেন না ভুতেরা দয়া করে আজ পর্যন্ত কখনো আমার সামনে মুর্ত হন নি। চর্মচক্ষে তাঁদের চর্চিতচন্দন শরীর অর্থাৎ শুভ্র শরীর দর্শন করার দুর্ভাগ্য আমার হয় নি। এই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট কন্সিডারেট বলা যেতে পারে। তেনাদের দেখা আমি পেলে আমার দেখা আর পাওয়া যেত কিনা সেটা বলা মুস্কিল। তো যা বলছিলাম, ১৯১১-এ যেমন করে দুই বাংলার বিভেদ রেখা মুছে গেছিল, ১৯৯০-এ যেমন পশ্চিম জার্মানি আর পূর্ব জার্মানির বিভেদ রেখা মুছে গেছিল, ঠিক সেরকম ভাবেই বাড়িতে যখন আমি একা, পাশের ঘরে পায়ের শব্দ টাইপ কিছু শুনলে scientific আর unscientific-এর সীমারেখা বেনো জলের মত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। কোন শালা মাথার ভেতরে বসে জরুরীকালীন অবস্থার নির্দেশ জারি করে দেয়। আর শরীরে জারি হয় কার্ফু। মানে বুঝতে পারছেন একেবারে "ঘেঁটে ঘ" কেস। হৃৎপিণ্ড যে গতিতে দৌড়োয় তাতে মনে হয় ডিডিএলজে ছবিতে সিমরনকে তার বাবা বলেছে "যা বেটা জী লে আপনি জিন্দেগি" আর সিমরন ধাবমান ট্রেনের পেছনে ধাওয়া করছে। পায়ের এবং হাতের পেশিরাও বর্ডারে ডিপ্লয় করা সেনাবাহিনীর মত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরী। তবে বলতে গেলে হাতের থেকে পা-টাই বেশি তৈরী কারণ কোনো এক বিচক্ষণ অন্তরাত্মা বলছে ভুতের সাথে হাতাহাতি করতে যাওয়া মানে রীতিমতো strategic disadvantage যেমনটা কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের ছিল। অতএব দেখিলেই চম্পট দিতে হবে এই মত প্রস্তুতি নিয়ে চলা আর কি! "Fight or flight" রেসপন্সের মধ্যে flight টাই বহুগুণে শ্রেয় বলে বোধ হয় তখন। যদিও নিজের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিটি ততক্ষণে সিংহ থেকে ইঁদুর হয়ে গেছে, তবু সেই বেচারি বিজ্ঞানমনস্ক সত্ত্বাটিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ হাতে একটা লাঠি কি ভারি কিছু নিতেই হয়। কারণ সে বেচারা মিহি সুরে বলছে "ছি ছি ভুত-টুত বলে কিছু নেই। ইঁদুর কি ছুঁচো টুচো হবে।" অবিশ্যি বলতে বলতে সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকায় যেন কোনভাবে তার কথা মিথ্যে প্রমাণিত না হয়। হলেই একেবারে সিধে চম্পট দেবে আর কি। হাতে লাঠি নিয়ে দুরু দুরু বুকে ভুতুড়ে শব্দের গোমুখ, আই মীন, ভুতুড়ে শব্দের উৎসস্থল অব্দি পৌঁছলেই দেখি কিছু নেই। হতে পারে আমি খুব একটা দুঃসাহসী নই জেনে দয়া করে তিনি আত্মগোপন করেছেন। ভৌতিক ব্যাপার দেখলে আমি যে খুব একটা কৌতুক বোধ করব না সেটা বিবেচনা করেই বোধ হয় তেনারা তেনাদের স্বরূপ দর্শন করান না। কিন্তু তাঁর ফলে মানসিক ভীতি কিছু কমে গিয়ে মানসিক স্থিতি কিছু লাভ করি তা নয়। সরেজমিনে তদন্ত করে ফিরে আসার পরেও মনের মধ্যে খচখচানি যেতে চায় না। বাড়ির বিভিন্ন প্রত্যন্ত কোন থেকে বিভিন্ন শব্দ কোণও এক অদ্ভুত অদৃশ্য নলের মাধ্যমে সরাসরি তখন আমার সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়র কাছে পৌঁছে যায়। মুস্কিল হচ্ছে যে ঘরটায় আমি আছি সেখানে কিছু গোলমাল দেখা যায় না। অন্য সব ঘরেই তাঁদের উৎপাত এবং বুৎপত্তি বেশ টের পাওয়া যায়। ফলাফল বিদ্যুতের অপচয়। অর্থাৎ কিনা সমস্ত ঘরে লাইট গাঁক গাঁক করে জ্বালিয়ে রাখা। লাইট জ্বালা

থাকলে মনে একটা বেশ বল পাওয়া যায়। ভুতেরা আলোয় বেশী ট্যাঁ ফু করতে পারে না শুনে এসেছি ছোটবেলা থেকে। আঁধারই তাঁদের শক্তির আধার। মানুষ যেমন সোলার পাওয়ার মানে আলো থেকে শক্তি ধরার উপায় আবিষ্কার করেছে ভুতেদের তো মানুষে যা করে তার উল্টোটা করতেই হবে। তাই ওরা অন্ধকার থেকে শক্তি ধরার উপায় বের করে ফেলেছে বহুদিন আগেই। যাকগে কথা হচ্ছিল আঁধারই তেনাদের শক্তির আধার। তাই তাদের দৌরাত্ম্যে বাধা দিতে গেলে বাড়ির সব কটা আলো জ্বালিয়ে রাখা অবশ্য কর্তব্য।

ভুতেদের বিশেষত্ব নিয়ে আমি খুব গভীরে গিয়ে ভেবে দেখেছি। আমার স্থির বিশ্বাস ওনারা হয় খুব লাজুক আর নয় বেশ কন্সিডারেট। কারণ ওই যে বললাম আজ অব্দি কোন ভুত আবির্ভুত হয় নি আমার চর্মচক্ষের সামনে । এটা তাঁদের যথেষ্ট বদান্যতা বলতে হবে কারণ চোখ চেয়ে দেখলে চিরতরে চোখ বুজে তেনাদেরই দলভারি করতাম এ আমার বেশ মনে হয়। দ্বিতীয়ত তেনারা যে কথায় কথায় ঘাড় মটকে দেন বলে অপবাদ দেওয়া হয় সে নেহাতই ভুতবিরাগীদের বাড়িয়ে বলা গল্পকথা। আমি বেশ কয়েকবার একলা বাড়িতে ভুতের খপ্পরে, ইয়ে মানে আমার মনপ্রসূত ভুতের কবলে পড়েছি কিন্তু আমার মাথাটা এখনো ঘাড়ের ওপর শান সে বিরাজমান এ কথা আমি বেশ টের পাই। ভুতের সিনেমা টিনেমা দেখে ভুতেদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞানগম্যি। আমার বিশ্বাস ওই অন্ধকারে একা একা বাড়ির নিচের বেসমেন্টে শব্দতালাস করতে গেলে তখনই ওনাদের মেজাজ খিঁচড়ে যায়। এইরকম মানুষসুলভ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে একটু আধটু ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স করে ফেলেন। ওনাদের ভাবটা যেন "দেখতে চাস আমায় ? দেখ তবে। দেখ কেমন লাগে!" আর কারু দুর্বল হৃদয় যদি এইটুকুতেই ইস্তফা দেয় তাতে তেনাদের মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। কোটি কোটি ভুতের সিনেমা দেখে সে কথা আমি আগেই জেনে গেছি। তাই ওই ভুল আমি কখনই করি না। নৈব নৈব চ। আমার ভাই সিধে হিসেব। রুল নাম্বার ওয়ান। একা তো যাবই না। সাথে করে একজনকে অন্তত নিয়ে যাব। মানে মরলে মরবো ডাবলে। রুল নাম্বার দুই। যে কোন ঘরে ঢোকার আগেই ঘরের লাইটটা জ্বালিয়ে নেব। আর রুল নাম্বার তিন হল বেসমেন্টে জাস্ট যাব না। বেসমেন্টে যদি ওনারা পার্টি করেন তাতে আমার কি ? করুন না। আরে বাবা দিনের বেলা তো ওনারা ছেড়েই দেবেন। তাই শুধু এই রাতটুকুর জন্য ওনাদের প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ না করলে যদি প্রাণ বেঁচে যায় তাতে তো কারুরই কোন অসুবিধে নেই। আর দু একটা ছোট ছোট রুল ভুতের ছবি দেখে শিখেছি। যখন ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে যে আশেপাশে ওনারা থাকতে পারেন তখন পারতপক্ষে আয়নার দিকে তাকাব না। ওনাদের একটা বাজে স্বভাব আছে ওই সময়ে আয়নার দিকে তাকালেই আমাকে আমার নিজের মুখটা না দেখিয়ে ওনাদের কারু একটা মুখ দেখিয়ে দেবেন। আমার নিজের মুখটা যথেষ্ট অদ্ভুতুড়ে হলেও ভুতুড়ে মুখ দেখলে যে আমি সকাতরে আর্তনাদ করব সেটা আর আশ্চর্য কি? আর একটা ওনাদের ভয় দেখানোর চেনা প্যাটার্ন জানি যে ফাঁদে আমি কিছুতেই পা দিই না। সেটা হল সেইরকম ভুতসন্নিবিষ্ট সময়ে আমি হারজিত অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নিচে থাকি না। কারণ থাকলেই আমি নিশ্চিত শাওয়ার থেকে জলের বদলে রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে। গরম গরম রক্তে স্নান করলে যে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সেটাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। তাই আমার মতবাদ হচ্ছে "Live and let live" সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতা। tolerance। তুমি বাপু তোমার মত থাকো আমি আমার মত থাকি। "আমি নিজেকে নিজের মত গুছিয়ে নিয়েছি। যা দেখি নি, দেখি নি তা না দেখাই থাক। সব দেখে খোয়াতে চাই না জীবন।" – আমি যে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে গুঁড়ি মেরে বিছানায় পড়ে আছি সেখানে তোমরা এসো না। আর তোমরা যেখানে ভুতের কেত্তন করছ সেখানে আমি যাব না। তোমরা আমায় জানার বা আমায় জানান দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমিও তোমাদের অন্ধকার জীবনযাপন ধারা জানতে অহৈতুক আগ্রহ প্রকাশ করব না। এই টেকনিক ব্যাবহার করে আমি অ্যাদ্দিন অব্দি বেশ বেঁচে গেছি। কপালজোরে আরও বছর তিরিশ টেনে দিতে পারলে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব। তখন আমি থোড়ি না আর ভুতে ডরাই। তখন ভুতের তোয়াক্কা না করে আমি নিজেই ভুত হয়ে বেয়াদব কৌতূহলীদের ভয় পাওয়ানোর নতুন নতুন ফিকির বের করব – যেমনটা হালফিলের কিছু ভুতের ছবিতে দেখেছি। যেমন হঠাৎ করে কানের সামনে তালি বাজিয়ে যাওয়া বা

জঙ্গলের মধ্যে একলা মা নিজের ছেলেকে ঘুম পাড়াতে "জুজু আয় তো" বলে ডাকলে ভৌতিক কণ্ঠে "আসছি" বলে সাড়া দেওয়া। ভুতেদের আর একটা ভৌতিক ক্ষমতা আমি লক্ষ করেছি কম্পিউটার, ডাটাবেস, স্প্রেডশিট ইত্যাদির সাহায্য ছাড়াই ওরা কেমন করে একটা কে কে ভুতের সিনেমা দেখছে সে খেয়াল রাখে। এবং ওনাদের ব্যাপারে অযথা কৌতূহল দেখানোর জন্য সেই রাতেই এসে সাজা দেয়। অর্থাৎ কিনা আমি দেখেছি যে রাতেই আমি ভুতের সিনেমা দেখে শুয়েছি সেই রাতগুলোয় বেশী বেশী করে ওনাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। অন্যদিনে ওনারা মোটেই জ্বালান না বা জানান দেন না কিন্তু ভুতের সিনেমা দেখে শুলেই দেখি পাশের ঘরে স্পষ্ট তেনাদের চলাফেরার আওয়াজ। হাবভাবটা যেন "শালা এবার কেমন লাগছে ? বল আর দেখবি?" যতই গোপনীয়তা অবলম্বন করে আপনি এই সাইট ওই সাইট ঘেঁটে একটা ভয়ানক ভুতের সিনেমার পাইরেটেড ফ্রী কপি আর সাথে কিছু ফ্রী ভাইরাস ডাউনলোড করুন না কেন, যতই কোন বন্ধুবান্ধব কাউকে না জানিয়ে একা একা বসে সিনেমাটা দেখে ফেলুন না কেন ওনাদের কান আছে সব দেওয়ালে। ঠিক খপর চলে যায়। আর রাতেরবেলা বেছে বেছে ভুতেদের গ্যাং আপনার বাড়িতেই হানা দেবে। আর ফলাফল সারা রাত ধরে আপনার ভূতগ্রস্ত অবস্থা। ওনাদের এই আশ্চর্য ক্ষমতাটি টের পেয়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনাদের ওপরে বানানো ছবি দেখা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু আমার বন্ধুরা সকলে আমার মত অতটা সহিষ্ণু এবং সংবেদনশীল নয়। তাই তাদের সঙ্গদোষে কখনও সখনো ন মাসে ছ মাসে একটা-আধটা . . . সে আমি যতই ওনাদের কাছে ক্ষমাটমা চেয়ে মনে মনে নাকখত দিয়ে বই দেখা শুরু করি না কেন ওনারা মোটেই কোন ছাড় দেন না। রাতেরবেলা জ্বালিয়ে মারবে। কিন্তু ওই যে রুলগুলো আপনাদের বললাম ওই কটা ফলো করে সে রাত্তিগুলোতে আমি ভারি উপকৃত হই। অন্তত সকালবেলা দেখি আমি তরতাজা না থাকলেও বেশ জলজ্যান্ত আছি। শরীরের সাথে মাথাটা ঠিক যে অ্যাঙ্গেলে সাধারণত থাকে ঠিক সেরকমটাই আছে অর্থাৎ কিনা মটকায় নি। সারারাত মটকা মেরে পড়ে থাকার এই অভাবনীয় সুফল আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি।

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

রম্যরচনা

তপনজ্যোতি মিত্র

ঈশ্বরকে স্পর্শ

আপনি কী ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছেন ?

থরথর করে কী একবার কেঁপে উঠলেন সাধক ?

তাঁর কুটির থেকে দেখা যায় দুরের এক অরণ্য আর এক বহমান নদী, সেদিকে তাকিয়ে সাধক আনন্দবিকাশ বললেন – কেন এই প্রশ্ন করছেন ?

অরুণ বললেন – আমার মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন গভীর হয়ে উঠেছে, আমাকে আকুল করে তুলেছে। আপনি কি করেন – প্রশ্ন করলেন আনন্দ।

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেলেন অরুণ, তাঁর মনের মধ্যে তুমুল তোলপাড়, প্রশ্ন করার প্রয়োজন নিয়েই তিনি এই আশ্রমে এসেছেন, প্রশ্নিত হওয়ার জন্যে নয়। তবু তিনি উত্তর দিলেন – আমি একজন লেখক।

কেন লেখেন – প্রশ্ন করেন আনন্দ।

এ এক অমোঘ প্রশ্ন, প্রতিদিন অরুণকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে, প্রতিদিন তাঁর মন তাঁকে প্রশ্ন করেছে – কেন লেখো, লিখে কি পাও, কোন মোহনায় পৌঁছতে চাও তুমি ?

সেই এক প্রশ্ন – গভীর গহন প্রশ্ন, যা তাঁকে নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে, মানুষের কাছে, উদার আকাশের কাছে।

ব্যথিত হয়েছে হৃদয় মানুষের দুঃখে, প্রকৃতির প্রতি অবিচারে, মন বিদীর্ণ হয়েছে মানুষের হাহাকারে, আবার কখনো বা সুখের কোনো অনুপম ছবি দেখে লিখেছেন জীবনের গভীর আনন্দের কথা।

কিন্তু কিছুদিন ধরে তাঁর মন হয়েছে গভীর উতলা, কেননা লেখনী বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। যে সব ভাবনা তাঁকে গতিশীল রাখত, ভাবাত, লেখাত, সেই সব ভাবনার উৎসমুখ যেন শুকিয়ে গেছে, নদী হয়েছে অবরুদ্ধ। অনুত্তর অরুণের চিন্তিত মুখ দেখে হাসলেন সাধক, তারপর কোমল স্বরে বললেন – ঈশ্বরের সাধনাতেও কখনো কখনো ভাঁটা আসে, যেন বিশ্বাস টলে যায়।

অরুণ যেন তাঁর তিরাস্ত্র খুঁজে পেলেন, প্রশ্ন করলেন – কেন এমন হয় ?

আনন্দবিকাশের আশ্রমে কোন দেব দেবীর মূর্তি নেই, আছে শুধু অনেক বই – দর্শনের, ইতিহাসের, বিজ্ঞানের, সাহিত্যের।

সেই সবের আলোচনাই বিস্তারিত হয় আশ্রমের প্রতিটি সন্ধ্যায়, অনেক লোক আসেন শুনতে, আর আনন্দবিকাশের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে ফিরে যান। আনন্দ খুব সুন্দর, শান্ত গলায় বললেন – এইই আমার ঈশ্বর চর্চা। মানুষকে জ্ঞানের আলোক পৌঁছে দেবার সাধনার মধ্যে দিয়েই যেন আমি ঈশ্বরকে স্পর্শ করি।

এবার অরুণ যেন থরথর করে কেঁপে উঠলেন – এই মহাপ্রচেষ্টাও তো তাঁর সাধনা।

কখন কোথায় খরার পরে বৃষ্টি নামবে,

কখন উড়ে আসবে হৃদয়ের হাজারো পাখি,

কখন কোথায় বেজে উঠবে সঙ্গীতের মহা তান,

কোথায় ঝরে পড়বে অশ্রুকণা,

আনন্দের আলোক এসে ধুইয়ে দেবে হৃদয়ের সব প্রাঙ্গণ।

কখন ধীরে নেমেছে সন্ধ্যা, আকাশে ফুটে উঠেছে অজস্র নক্ষত্র, মেলে ধরেছে তাদের অনন্ত ঐশ্বর্য, অরুণ সেদিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে গেলেন।

তাঁর চোখে তখন গভীর আনন্দাশ্রু, হাত দুটি সাধকের প্রতি প্রণাম জানাল – অনেক ধন্যবাদ মহারাজ, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ডাকতে ডাকতে তার গন্তব্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ এক পাখি, বহুক্ষণ তার ডাক শোনা যেতে থাকলো।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ১৪

আমি জানি — কাল বৃষ্টিত সন্ধ্যায়
আকাশে যখন আমার বুকের রঙ
একবার তুমি হয়েছিলে আনমন
শ্বাস-প্রশ্বাস ছুটেছিলো রণপায়ে
মনে কি পড়েছে — মহেঞ্জোদারো দেশে
স্নানাগার সিঁড়ি ধাপে শুয়ে দুইজনে
জ্যোৎস্না-বৃষ্টি ভিজেছে শরীরে মনে
আদম-ইভের পুণ্য মিলন শেষে
সন্তান এলো — নাম নিলো সে কবিতা
বেঁচেছিলো পাঁচ হাজার বছর টানা
সম্প্রতি বইমেলায় জ্বলেছে চিতা
ভাঙাচোরা কীটদষ্ট সে বাড়িখানা

এসো পালি, ফের মহেঞ্জোদারো যাই
পৃথিবীকে ফের বাঁচাবে সে কবিতাই

সনেট ১৫

নাগরিক বৃক্ষদেহে বহুবর্ণ চোখ
গন্ধফুল হয়ে করে কাহিনী সন্ধান
ছিন্নপত্রাবলী খুঁজে খুঁজে হয়রান
ক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষায় কৌতূহলী শ্লোক

পালি কি পালিতা নারী কবির উল্লাসে ?
বত্রিশ পুতুল সিংহাসন-শোভিত ?
পালি কি থাকবে শুধু ভাষা-অনুদিত ?
মুদ্রিত রাখাল হবে দেবতার গ্রাসে ?

গড়িয়াহাটের মোড়ে অচেনা ঈশ্বরী
রোজ সন্ধে সাতটায় বাস থেকে নামে

অফিস-বাজারভিড়ে আহা মরি মরি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে কবিতার ঘামে

কবিতায় শহরের মলাটকাহিনী ।

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি — প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ — যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস — একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা — খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

আয়ো বরষিয়া

আবার দিও একখানা
মেঘ,
বৃষ্টি কয়েক ফোঁটা,
মেঘ ভেজেনি
অনেকদিনই
একটা বিকেল গোটা,
হারিয়ে যাওয়া হয়নি যে
তার
নীলাভ আকাশ মাঠে,
ধুসর কিছু ধুল জমেছে
মনের রাস্তা ঘাটে,
বৃষ্টি নামুক উথালপাতাল
ঘাট-কাজরী রাগে,
যেমন করে সন্ধে নামে
রাত্রি নামার আগে,

অভিমানের মোম গলেনি
মেঘও দুরে থমকে,
বরষন লাগে ও বদরিয়া
আয়ো রুমঝুম কে ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

স্বপন ভট্টাচার্য

সফর

১.

সাদা কালো বাদামি হরিদ্রাভ মিলে এই এক রামধনু দেশে
কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে নি আমি কোথাকার লোক
পাবে গেলে জুয়াড়িরা আমাকে একপাত্তর দিয়ে উৎসব করতে বলে
প্রশ্ন করে না – কতদিন এসেছি – বেড়াতে? না পাকাপাকি থেকে যাবো শেষে ?

যে কোন শহরে সদ্য আগত ট্যুরিস্টরা আমাকে দেখেছি স্থানীয়ই ভাবে
এবং ম্যাপ হাতে জানতে চায় এ শহরে চিড়িয়াখানা বা জাদুঘর কোথায় ?
আমি তাদের বাসস্টপ চিনিয়ে দিয়ে বলি – এইখানে সব বাস থামে
উঠে জিজ্ঞেস করে নিও ড্রাইভারের কাছে – এই বাস আলিপুর যাবে ?

২.

অপেরায় বিজ্ঞাপিত টিকিটের দামে
দেখা গেলো ছাড় আছে দু ধরনের –
আমি যদি ছাত্র হতাম তাহলে কিছুটা
আর কিছু ছাড় আছে আমি আজ সিনিয়র বলে।
কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটিকে ক্ষমা চেয়ে বলি
আমি সিনিয়র বটে তবে কোন নথি নেই চাইলে দেখাবার।
তিনি হেসে বলেন – ছাত্রের কাছে চাই, বৃদ্ধের কথাটাই নথি
ভাবি, জ্ঞানাবধি কাল – একই রকম আছি, তবে ক্ষতি কি
বয়সটি ধারে-কর্জে জমা দিয়ে দেব নির্বিবাদে
যদি তুমি প্রতি রাত মোৎজার্ট শোনালে।

জন্ম ১৯৫৫ । শৈশব ও কৈশোরকাল আবাসিক বিদ্যালয়ে। লেখালেখির শুরুও সেখান থেকেই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের পাঠ ও গবেষণা। অধ্যাপনার বৃত্তি থেকে অধুনা অবসৃত। সত্তর ও আশির দশকে সম্পাদনা করেছেন ঋত্বিক পত্রিকার। প্রায় চার দশক সময়কাল মূলত ছোট পত্রিকায় লিখে আসছেন পদ্য ও ছোটগল্প। পরিচালিত নাটকের সংখ্যা ত্রিশোর্ধ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ওষধিবাগান' পাঠকের সমাদর পেয়েছে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় মুদ্রণের অপেক্ষায়। ২০১৮ তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংকলন 'গ্যালিয়ানোর আয়না ও অন্যান্য কবিতা' তাঁর পরিচিতি ব্যাপকতর করেছে।

পার্থ প্রতিম ঘোষ

বিক্ষত ভগবান

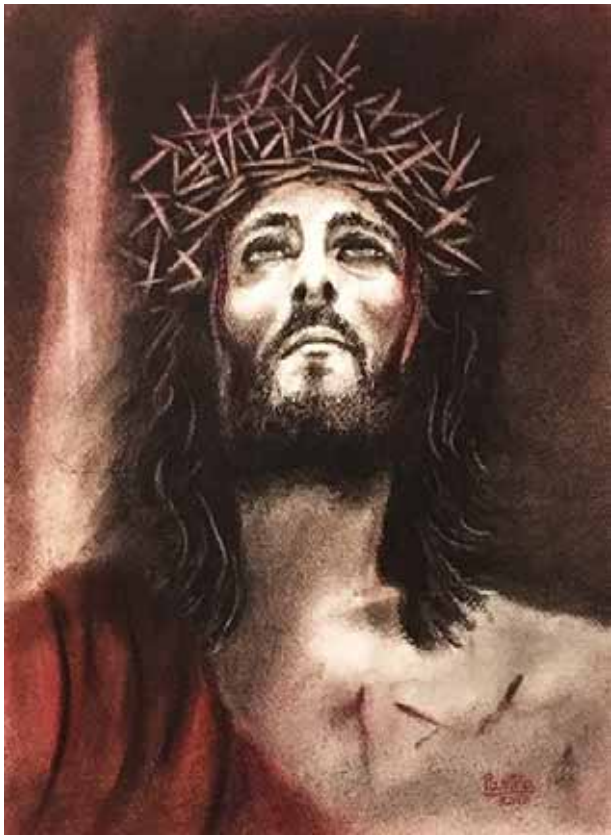

"মানুষকে ভালোবেসে কাঁটার মুকুট পরেছিল ঈশ্বর
তবু সভ্যতার পরতে পরতে মিশলো কালো ধোঁয়া
প্রেম নয়; মানুষ চাইলো হতে অবিনশ্বর ।
ভালোবেসে জড়িয়ে ধরার হাত ক্রুশের গায়ে আঁটা
পেরেকের শব্দে হারিয়ে যায় নিঃশব্দ ফুল ফোটা ।
বিশ্বাস ঘাতকের পা ধুইয়ে দেওয়া সেই পবিত্র হাত
দেখো – সে হাতে হয় প্রতিনিয়ত রক্তপাত ।
ক্রুশবিদ্ধ দেহ, বিক্ষত হৃদয়, রক্তাক্ত মুখ
মানুষের চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত ঈশ্বরের বুক
যে পরমাত্মা এক হতে চেয়েছিল মানবাত্মার তরে
মানুষের ঘৃণা, অহংকার, লালসার দূষণে
ঈশ্বরের হৃদয়ে প্রতিদিন অবিরাম রক্ত ঝরে ।"

– অপর্ণা মজুমদার

Partha Pratim Ghosh – As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

A professional in social work and social development sector with an extreme passion in poetry, Aparna loves to write poems, short stories and novels. She is an Anthropologist and expert in Gender Studies. Her poems are published in US Bangla Forum, a US based Bengali magazine.

শহিদুল ইসলাম

"সত্যেন বোস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরি"

১৯৭১ সালের ৫ জুন সুব্রত মজুমদার, আনিসুর রহমান ও আমি বেলা ১১টার দিকে উত্তর কলকাতার ৩ ঈশ্বরীপ্রসাদ লেনে যাই ঈশ্বর দর্শনে। দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যেতে থাকি। সুব্রত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের তরুণ শিক্ষক। আমরাও। সুব্রতের বাবা সত্যেন বোসের ছাত্র ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে সুব্রতের পূর্ব পরিচয় ছিল। সুব্রতের বড় বোন কলকাতার গড়িয়া নিবাসী।

শরণার্থী আমরা কয়েকদিন দিদি-সুনীলদার বাড়ীতে ছিলাম।

আমরা যথাস্হানে নামলাম। ধীরে ধীরে ঈশ্বরীপ্রসাদ লেনের দিকে এগুতে থাকি। শেষে পৌঁছে গেলাম লেনের মাথায়। একগজ চওড়া একটি অপরিষ্কার গলির মুখে দাঁড়িয়ে একটু হোঁচট খেলাম। যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের সঙ্গে গবেষণা করা আমাদের গর্ব সত্যেন বোসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাঁর বাড়ীর লেইনটি আমাদের সে স্বপ্নে কিছুটা আঁচড় দিল। দু'হাত চওড়া গলির বাঁ পাশের একহাত জুড়ে বয়ে চলেছে একটি নর্দমা। ডান দিকের একহাত চওড়া রাস্তা দিয়ে পাশের দেয়াল ধরে দু'টি বাড়ীর পর একটি শতবর্ষী ভাঙ্গা অংশ দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। চুনকাম উঠে গেছে, ক্ষয়ে যাওয়া ইঁটগুলো দাঁত বের করে আছে। খোলা অংশটুকু পার হয়ে একটি খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুব্রত একটু জোরে কাশি দিয়ে আমাদের আগমনবার্তা ভিতরে পাঠিয়ে দিল। কোন কলিং বেলের ব্যাপার ছিল না।

একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা এসে আমাদের ইশারায় গন্তব্য নির্দেশ করলেন। আমরা তাঁর দেখানো দরজা দিয়ে একটি পুরনো প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রবেশ করলাম। ছোট ছোট জানলা দিয়ে মৃদু আলো এসে ঘরটিকে রহস্যময় করে তুলেছে যেন। দেখি একটি বড় চৌকির ওপর সাদা চাদর পাতা। তার ওপরে বসে আছেন বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেটের স্রষ্টা সত্যেন বোস। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন খালি গায়ে । গরম। তাঁর মাথার ওপর একটি রঙচটা ফ্যান ঘুরছে মৃদু শব্দ করে। পুরু চশমার খুবই কাছে একটি থিসিস গোছের কিছু দেখছেন। কোলের ওপর মোটা কোলবালিশ। তার ওপরে থিসিসটা রেখে দেখছিলেন। আমাদের দেখে থিসিসটা নামিয়ে রেখে একে একে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। সুব্রতের দিদি জামাইবাবুর খবর নিলেন।

আমি ঘরটি ভালভাবে দেখলাম। দু'টি কাঠের হাতলবিহীন চেয়ার। বসতে বললে আনিস ও সুব্রত চেয়ারে আর আমি চৌকির ওপর অত্যন্ত সমীহের সাথে বসলাম। ঘরে বাড়তি কোন আসবাবপত্র নেই। এককোনে পালা দেয়া আছে পৈত্রিক আমলের সোফাসেটগুলি। সেগুলির ভিতরের স্প্রিংগুলি ছেড়া চামড়া ভেদ করে তাকিয়ে আছে। দেয়ালগুলিতে যে কতদিন কোন পরিচর্যার স্পর্শ পায় নি, সেকথা বলা যাবে না।

কাউকে ডেকে চা দিতে বললেন। তারপর আমাদের প্রত্যকের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। আমার বাড়ী ঈশ্বরদী শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বরদীতে বিদ্যুৎ গেছে?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি ঈশ্বরদী গেছেন?' উত্তরে বললেন, 'হ্যা,পাবনা যেতে ঈশ্বরদী হয়েই তো যেতে হয়।' তারপর যে গল্পটি বললেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। ১৯১১ সালে তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পাকশীতে পদ্মা নদীর ওপর ব্রিজ হচ্ছে। সেখানে হৈ হৈ ব্যাপার। ইংরেজ সাহেব ও দেশীয়

কর্মচারি কর্মকর্তার পদভারে অঞ্চলটি কম্পিত। সত্যেন বোসের বাবা চিফ একাউন্টেন্ট। পাকশীতে থাকেন একটা বাঁশের বেড়া ও ওপরে খড়ের ছাদ দেয়া বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীতে। কলকাতার কর্মচঞ্চল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে তিনি আসেন পাকশীতে নিরিবিলিতে পড়াশুনা করতে। পরীক্ষার দু'দিন আগে কলকাতায় ফিরে পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু ৪/৫দিন আগে হঠাৎ করে তাঁদের বাড়ীতে আগুন ধরে যায়। সবকিছুর সঙ্গে সত্যেন বোসের বইপত্রনোট সব পুড়ে যায়।

ভাঙ্গা মন নিয়ে কলকাতায় ফিরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন। ফল বেরুলে দেখা গেল তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্হান অধিকার করেছেন। বলাই বাহুল্য ১৯১৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সে এবং ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে প্রথম স্হান অধিকার করেছেন।

যাহোক, তিনি আমরা কে কি পড়াই জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, 'তোরা কি কখনও আগে কলকাতায় এসেছিস ?' আমি ও আনিস বললাম, 'না'। উনি বললেন, 'তোরা এখানে কিভাবে থাকবি ? কতদিন থাকতে হবে, কে জানে ! কি করবি ?' আমরা কি বলবো ? চুপ করে রইলাম। উনি তখন হাতের ডানে রাখা টেলিফোনটা তুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি. সত্যেন সেনকে ফোন করলেন। সেন ফোন ধরলে তিনি বললেন, 'সত্যেন, আমার সামনে বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন যুবক শিক্ষক বসে আছে। ওদের দু'জন কেমিস্ট্রি ও একজন গণিত পড়াতো। তোর ওখানে কি তুই একজনকে নিতে পারবি ?' ওদিক থেকে সেন কি বললেন তা আমরা শুনতে পাই নি। বোস কেবল 'আচ্ছা' বলে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালককে ফোন করে একই কথা বললেন। ওদিক থেকে পজিটিভ আশ্বাস পেলেন বলে মনে হল। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি. অরবিন্দু বসুকে ফোন করে বললেন একই কথা। অরবিন্দু বাবুর সঙ্গে যে কথাবার্তা হল, তা আমরা শুনতে পেলাম। উনি একজন কেমিস্ট্রির শিক্ষককে নিতে চাইলেন এবং পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সত্যেন বোস বললেন, 'এরা তো আগে কলকাতায় আসেনি। রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না'। তখন অরবিন্দু বসু বললেন, 'উনি কোথায় থাকেন ? আমি কাল সকাল ৮টায় গাড়ী পাঠিয়ে দেব।' বোস আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে উনাকে বললেন, 'ওর নাম শহিদুল ইসলাম। আপাতত বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজের সুপারের বাড়ীতে থাকে।' ওপার শোনার পর টেলিফোন রেখে আমাকে বললেন, 'কাল সকাল ৮টায় ও গাড়ী পাঠাবে। তৈরি থেকো।' আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। সুব্রতের বললেন, 'তুমি কাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের এম.ডি'র সঙ্গে দেখা করো। তারপর উনি ফোন করলেন বেঙ্গল ইমিউনিটি ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্সের ডাইরেক্টরকে। বললেন, 'বাংলাদেশের একজন শরনার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি পড়াতো,তাকে নিতে পারবি ?' তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। আনিস পরদিন সেখানে গিয়ে যোগ দিল ।

পরদিন সকাল ঠিক ৮টায় ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্সের চিফ কেমিস্ট ড. নিয়োগী গাড়ী নিয়ে সায়েন্স কলেজের সুপার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের ডীন ড. অনিল সরকারের বাড়ীতে হাজির। আমি তার সঙ্গে সোজা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি'র অফিসে উপস্হিত হলাম। ভি.সি'র অফিস দেখে আমার ভিমড়ি খাওয়ার অবস্হা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কেরানির ঘরও তার চেয়ে ভাল। তাঁর টেবিলের সামনে রাখা কাঠের চেয়ারে বসলাম। উনি রেজিস্ট্রারের নাম ধরে ডাকলেন। কাঠের পার্টিশনের ওপাশ থেকে রেজিস্ট্রার এলেন। 'উনার একটি জয়েনিং রিপোর্ট নেন ফুড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের জন্য।' আমার ও আনিসের গেস্টহাউসের একটি করে কক্ষ দেয়া হল। ৯ মাস স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

সত্যেন বোসের প্রভাব লক্ষ্য করে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। টেলিফোনে আমাদের তিনজনের চাকরি হয়ে গেল। সবাইকে 'তুই'। এমন সম্মান ! শুনলাম ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বাংলায় কাজে আসলে বিমান বন্দর থেকে

সোজা আগে ঈশ্বরীপ্রসাদ লেনে ঈশ্বরপ্রণাম ক'রে দিনের কাজ শুরু করতেন। সেই মানুষটি যে সহজসরল জীবন যাপন করতেন, না দেখলে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। ১৯৭১ সালের শরণার্থী জীবনে আমার সবচে 'বড় পাওয়া প্রফেসর সত্যেন বোসের সঙ্গে তিনবার দেখা হওয়া।' একদিন বলেন, 'সেই ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে বসে পাঁচ পাতার কি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা নিয়ে এখনও কেন যে এত হৈচৈ হয়, বুঝিনা।' কতবড় মানুষ হলে এমন কথা বলতে পারেন। যে প্রবন্ধটি স্বয়ং আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সেযুগের শ্রেষ্ঠ গবেষণা পত্রিকায় ছেপেছিলেন। স্বয়ং আইনস্টাইনের সঙ্গে যার নামটি জড়িত, তাঁর মুখ দিয়েই এমন কথা বেরুতে পারে।

'এক কাপ চা ও দু'টি মেরি গোল্ড বিস্কিট খেয়ে ঈশ্বর প্রণামান্তে আমরা দিগ্বীজয়ের আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে এলাম।'

শহিদুল ইসলাম – সাবেক অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ, শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি ২০১৩।

অনুবাদ

সুজয় দত্ত

রৌদ্রছায়া

(পুষ্পা সাক্সেনার গল্পের অনুবাদ)

''মা, আজ দুপুরে আমার এক বন্ধুকে এখানে খেতে বলেছি। ও গত দুমাস কাজকর্মের ব্যাপারে বাইরে ছিল, এই ফিরেছে'', মোবাইল দেখতে দেখতে মাকে জানাল কমল।

''আরে আগে বলবি তো! এত তাড়াতাড়ি এখন কী বানাই?'' বিভা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

''দূর, অত বানাতে-টানাতে হবে না, ও এমন কিছু ভি আই পি নয়। সোজাসাপ্টা কোনো রান্না — এই যেমন তোমার হলুদ পোলাও মানে তহ্‌রী — করলেই হবে। আলু, মটর আর দালিয়া নিশ্চয়ই আছে ঘরে।'' কমলের চটজলদি সমাধান।

''আচ্ছা, তহ্‌রী কখনো কেউ অতিথিকে খাওয়ায়? তোর ভাল লাগে মানেই যে তোর বন্ধুরও খিচুড়ি ভাল লাগবে এমন কোনো কথা আছে?'' বিভাকে অপ্রসন্ন দেখায়।

''তুমি মিছিমিছি টেন্‌শন করছ, মা। জয়কুমার আধা-ভারতীয়। ওর বাবা ভারতীয় ছিলেন, তাই জ্যাকি হিন্দীটা ভালই বোঝে আর বলে। ওকে আমি খুব ভাল করে চিনি। একসঙ্গে ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে আমার আর ওর পছন্দ-অপছন্দ এখন এক হয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তোমার অভ্যেসমতো ওকে আবার ওর বাবা-মা সম্বন্ধে একগাদা প্রশ্ন কোরো না। তোমার তো বকবক করা অভ্যেস, তাই বলছি।''

''কেন, কারো বাবা-মা সম্বন্ধে জানতে চাওয়া কি অপরাধ?'' বিভার গলায় বিস্ময়।

''যার বাবা-মা নেই তাকে ওসব জিজ্ঞেস করাটা ঠিক নয়। অনাথ না হয়েও ও অনাথের মতোই জীবন কাটিয়েছে। ওর অনেক ছোটবেলাতেই বাবা আর মা আলাদা হয়ে যান। ওঁরা দুজন তো নিজের নিজের স্বতন্ত্র জীবন নিয়ে আছেন ভালই, কিন্তু মাঝখান থেকে জ্যাকিই একলা হয়ে গেল।''

''আহা বেচারা রে। আচ্ছা, ও কী পড়ছে এখন?''

''কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং''

''তাই নাকি? বাপ-মার সাহায্য ছাড়াই ওরকম একটা জিনিস নিয়ে পড়তে পারল? এদেশে তো পড়াশোনার ভীষণ খরচ।''

''আমেরিকায় এরকম প্রায়ই দেখা যায়। নিজেদের কলেজে পড়ার খরচ অনেক ছেলেমেয়েই নিজেরা জোটায় কাজকর্ম করে। জ্যাকির জেদ ছিল। পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছেয় ও অন্যের গাড়ী ধুয়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে খবরের কাগজ দিয়ে, রেস্তোরাঁ আর গ্রোসারি স্টোরে কাজ করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। এম্ এস্ সিতে দারুণ রেজাল্ট করেছে। এখন স্কলারশিপ পেয়ে পি এইচ্ ডি করছে। ডিপার্টমেন্ট হেডের প্রিয় ছাত্র।''

''তুই তো এখনো এম্ এস্ সি করছিস। ও তোর বন্ধু হল কী করে?''

''আমার তো টীচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ আছে। জ্যাকি আমার সিনিয়র টি এ। কখনো কোনো কিছু আটকে গেলে ওর কাছেই যাই সাহায্যের জন্য। এইভাবেই যেতে-আসতে একসময় আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ও ওর জীবনের দুঃখকষ্ট আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে শুরু করল।''

''কী জানি বাবা, এখানকার কথা যত শুনি তত অবাক হয়ে যাই। এখানকার মানুষের রকমসকম আর জীবনযাত্রার ধরণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা। সব দেখে-টেখে মনে হয়, আমাদের ভারতই মহান।''

''আরে, সবে তো দুমাস হল এসেছ এখানে। আরো অনেকদিন থাক, দেখবে আমেরিকাকে ভালবেসে ফেলেছ। এখন আর কথা বাড়িয়ো না, তাহলে তোমার তহ্‌রীর বদলে আমাকে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনতে হবে।''

রান্নাঘরে গিয়ে বিভা ফ্রিজ থেকে কপি, কড়াইশুঁটি আর আলু বার করলেন। করতে করতে মনে হল, ছেলে তো ঠিকই বলে — এদেশে রান্নাবান্না করা কত সোজা। ছাড়ানো কড়াইশুঁটি, টুকরো করা কপি, ডুমোডুমো করে কাটা সব্জী — এসব কী দেশে পাওয়া যেত ? অবশ্য দেশে মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসে একটা একটা করে কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে খাওয়ারও আলাদা আনন্দ আছে। যাইহোক, খানিকক্ষণের মধ্যেই রান্নাঘর থেকে ঘি-মশলার সুগন্ধ বেরোতে শুরু করল। তহ্‌রী বানানো শেষ করে বিভা রায়তা আর স্যালাডে মন দিলেন। পাপড় আগেই সেঁকে রেখেছিলেন।

দরজায় বেল বাজতে কমল গিয়ে খুলল। জীন্স্, জ্যাকেট আর ঝকঝকে সাদা টিশার্ট পরা জয়কুমার মিষ্টি হেসে পা বাড়াল ভেতরে।

''হাই জ্যাকি। এসো এসো। মা, জ্যাকি এসে গেছে।'' ডাক শুনে বিভা বেরিয়ে আসতেই কমল পরিচয় করিয়ে দেয়, ''জ্যাকি, এই হল আমার মা। আর মা, এই আমার সেই প্রিয় বন্ধু জয়কুমার — একে আমরা সবাই জ্যাকি বলি।''

হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে জ্যাকি বলল, ''আমি কি আপনাকে 'মা' বলে ডাকতে পারি ?''

''না পারার কী আছে বাবা ? আমার কাছে কমল যেমন, তুমিও সেরকম। দেখেছিস কমল, ও আমাকে ঢুকেই নমস্কার করল আর 'মা' বলে ডাকল। আর তুই ? নিজে ভারতীয় হয়েও লোককে খালি 'হায় হায়' করিস।''

আমেরিকানরা হ্যালো-র বদলে যে জিনিসটা বলে সেটা যে মায়ের মোটেই পছন্দ নয়, কমল জানে। সে হেসে বলল,

''ওঃ, মা, ওটা 'হায়' নয়, 'হাই'। আর আসল কথাটা বলি এবার ? কাল আমাকেই জিজ্ঞেস করছিল এই শ্রীমান — তোমার মাকে কী বলে ডাকলে উনি ইম্প্রেস্‌ড্ হবেন ?''

''সে যাই হোক, ও এদেশে বড় হয়েছে, তা সত্ত্বেও তোর দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে আগ্রহ দেখিয়েছে তা-ই বা কম কী ?''

''আচ্ছা বাবা আচ্ছা। এখন খাবারদাবার কিছু পাওয়া যাবে, নাকি জ্যাকির প্রশংসা শুনেই পেট ভরাতে হবে ? জ্যাকি, কী ড্রিংক নেবে ?''

''তুই তো জানিস কমল, আমার সবসময় সাদা জলই পছন্দ।''

কমল ফ্রীজ থেকে ফলের রস বার করে দুটো গ্লাসে ঢেলে একটা বাড়িয়ে দেয় জ্যাকির দিকে, ''একটু ফ্রুটজুস খাও, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। টেবিলে তোমার জন্য জলও রাখা আছে।''

বিভাকে প্লেট ইত্যাদি আনতে দেখে জ্যাকি তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে এগোয়, ''মা, ছাড়ুন ছাড়ুন, এসব আমরা দুজনেই করে নিচ্ছি। কিরে কমল, তুই মাকে সাহায্য-টাহায্য করিস না ?''

''আরে আমার মা দারুণ এফিসিয়েন্ট, একাই একশো। আমাকে কোনো কিছু করতেই দেয়না।''

''অ্যাই, আসল সত্যিটা চেপে যাচ্ছিস ?'' মায়ের গলায় কপট অভিযোগের সুর, ''তুই কেমন আলসেকুঁড়ে সেটা বল ! বাড়ীতে তো চিরকাল সবার ওপর হুকুম চালিয়েই এসেছিস। এক গ্লাস জল কোনোদিন নিজে গড়িয়ে খেয়েছিস ?''

''ঠিক আছে, মানছি, কিন্তু এদেশে চলে আসার পর আমার নিজের কাজ আমি নিজে করিনা ? কে করে দেয় ? তুমি আসার পর থেকে অবশ্য আলাদা ব্যাপার। ছুঁতেই দাওনা কোনোকিছু।''

''আচ্ছা অনেক হয়েছে, এবার থাম দিকি ! জ্যাকিকে খেতে দে।''

জ্যাকি মা-ছেলের চাপান-উতোর শুনে মুচকি মুচকি হাসছিল। প্লেটে বিভাকে তহ্‌রী ঢালতে দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। হঠাৎ বলে বসল, ''আমার বাবা এইরকম তহ্‌রী খুব ভালবাসতেন। বলতেন ওঁদের লখ্‌নৌয়ের বাড়ীতে নাকি ছুটির দিন হলেই বানানো হত এ-জিনিস। যেদিন মা বাড়ী থাকত না, বাবা নিজের হাতে তহ্‌রী রেঁধে খাওয়াতেন আমায়। সঙ্গে আপনি এই যে রায়তা আর পাঁপড় দিয়েছেন, সেটাও বাবা চেষ্টা করতেন কিন্তু সবসময় হয়ে উঠত না।'' বলতে বলতে স্মৃতিতে ডুব দেয় ও — উদাস হয়ে যায় কেমন যেন।

''আরে ওসব কথা এখন থাক। তোমার এরকম উদাস মূর্তি ভাল লাগছে না। দেখতে অভ্যস্ত নই তো। তুমি বিন্দাস ছেলে, রাতদিন হাসি লেগেই থাকে মুখে —'' কমল কথা ঘোরাতে চায়।

''কেন গো, তোমার মা কি তোমার বাবার পছন্দমতো রান্নাবান্না করতেন না ?'' বিভা কৌতূহল চাপতে পারেন না, মুচকি হেসে বলতে থাকেন, ''আমাদের ঘরে তো পুরুষমানুষের ইচ্ছে অনুযায়ীই সবকিছু হয়। এই কমলই তো দেশে থাকতে নিত্যনতুন ফরমায়েশ করত আর আমাকে সেইমতো সব বানাতে হতো।''

''আসলে আমার মা খাঁটি আমেরিকান ছিল, আর বাবা তেমনই নিখাদ ভারতীয়। জানিনা এই গরমিলের দাম্পত্যজীবন এগারো বছর টিকেছিল কী করে। মা বিয়ের পর বাবার সঙ্গে লখ্‌নৌতে ছিল কিছুদিন, কিন্তু সেখানে আমেরিকার মতো জীবনযাত্রার মান আর সুযোগসুবিধা তো নেই। এই ব্যাপারটাই মার মনে ভারত সম্বন্ধে এমন চিরস্থায়ী বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল যে এর পর বাবার লখ্‌নৌ যাওয়ার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বাবা অগত্যা মন খারাপ করে পড়ে থাকতেন এই মুলুকে। এদেশের এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও বাবা লখ্‌নৌকে ভুলতে পারেননি।''

''হ্যাঁ, সেকথা ঠিক, আমাদের ভারতের ঘরে-ঘরে তো আর এখানকার মতো স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসিতা নেই। এদেশে বড় হয়েছে যারা বা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে, তাদের পক্ষে সেসব ছেড়ে নীচুমানের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। এটাই তো স্বাভাবিক।''

''তাহলে বাবা কেন লখ্‌নৌকে কোনোদিন মন থেকে মুছতে পারলেন না ?''

''আবার এটাও তো সত্যি যে যেখানেই থাক না কেন, নিজের জন্মভূমির প্রতি নাড়ির টান ছিঁড়ে ফেলা যায়না।''

''একদম এই কথাটাই হিরণ আন্টিও বলতেন। উনিও নিজের দেশের স্মৃতিতে ডুবে থাকতেন।''

''হিরণ আন্টি কে গো বাবা ?'' বিভার ঔৎসুক্য বেড়েই চলে।

''উনি বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা এসেছিলেন। ওঁর স্বামী এখানকার সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধে আংকল্ মারা গেলেন, আন্টি হয়ে গেলেন একেবারে একা। ওঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল অনেকে, উনি প্রত্যাখ্যান করেন। বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর আমিও যখন একদম একলা, আমার জন্য নিজের বাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আমি খুচখাচ চাকরি-টাকরি করে ওঁকে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছি অনেকবার, কিন্তু কক্ষণো নেননি উনি। সবসময় বলতেন ঐ টাকা ভবিষ্যতে আমার পড়াশোনা জন্য লাগবে। আজ শুধু ওঁর জন্যই এতদূর পৌঁছতে পেরেছি, জানেন ?'' জ্যাকির গলা ভিজে আসে।

''তোমার এই আন্টি তো সত্যিকারের মহান মানুষ। এঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'' সোৎসাহে বলে ওঠেন বিভা।

''তা যদি হতো মা, কী ভালই না লাগত আমার। কিন্তু তিনি আজ কোথায় ? আমাকে এমন জীবন দান করে তিনি বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। তবে আমার স্মৃতিতে উনি চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবেন। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি।'' হঠাৎ খাওয়া শেষ করে হাত মুছে উঠে দাঁড়ায় জ্যাকি। মুখে সেই বিষাদের ছাপ।

জ্যাকির বিদায়ের পর অনেকক্ষণ বিভা ওর জীবনের নিঃসঙ্গতার কথা ভাবতে লাগলেন। ''কী হতভাগ্য ছেলেটা। বাপ-মা বেঁচে থাকতেও অনাথের মতো জীবন কাটাচ্ছে। যে মহীয়সী মহিলা পর হয়েও ছেলেটাকে আশ্রয় আর সহায়তা দিয়েছেন, তাঁর আত্মার স্বর্গবাস হোক।''

''তুমি মিছিমিছি দুঃখ করছ মা। এদেশে এরকম ভাঙা পরিবার জলভাত। প্রেম-ভালবাসা শুকিয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিতে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের নিজের নতুন জীবন শুরু করে। এখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এটা নিতান্তই সহজ আর স্বাভাবিক।'' কমল বোঝাবার চেষ্টা করে।

সেদিনের সেই সাক্ষাতের পর জ্যাকি ঘনঘন কমলের বাড়ী আসা শুরু করল। বিভার সঙ্গে গল্প করতে খুব ভাল লাগে ওর। এই কদিনে যেন পাল্টে গেছে ছেলেটা। ওর খোলামেলা আচরণে কমলও অবাক হয়ে যায়। আগের সেই বিষাদ-টিষাদ কোথায় ? এখনও দারুণ প্রাণবন্ত। বিভার স্নেহে আর প্রশ্রয়ে ওর মধ্যে আর কোনো জড়তা নেই, সবসময়ই হাসিখুশী আর কথায় কথায় খালি ঠাট্টা-ইয়ার্কি। ওর ফাজলামিতে বিভাও হেসে কুটিপাটি হন। দেখে মনে হয় যেন শৈশবে-কৈশোরে যে জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও, এখন বিভার সঙ্গে তা সুদে-আসলে উশুল করে নিচ্ছে। ও বাড়ীতে এলে বিভারও একাকিত্ব আর শূন্যতাবোধ নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

ও যখন থাকে না, আর কমলও ইউনিভার্সিটিতে থাকে, তখন বিভার প্রাণ ছটফট করে ওঠে। দেশের আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী আর পুরনো বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে। চোখের জল মুছে ছেলেকে বলেন, ''এ কেমন দেশ রে বাবা ! সবাই রাতদিন ব্যস্ত আর কিসের পিছনে যেন ছুটছে। এভাবে একা একা থাকা যায় ? তোর বাবা আমায় ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে না গেলে এই বয়সে আর এদেশে আসতে হতো না।''

''আরে অত চিন্তা কোরোনা। আর কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার ইন্ডিয়ান কমিউনিটিতে তোমার আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে, তখন আর বোর হবেনা। তার ওপর তুমি আবার গান-টান জানো। দেখবে কিরকম পপুলার হয়ে গেছ। চাইলে গানের ক্লাসও খুলতে পার। অনেক ছাত্রছাত্রী জুটবে।''

কমল ঠিকই বলে। এদেশের অনেক প্রবাসী ভারতীয় পরিবারই তাদের ছেলেমেয়েদের হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখাতে উৎসাহী। অন্ততঃ এভাবে তো মা ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা সংস্পর্শে থাকতে পারবে। কমলের এই প্রস্তাব ভালই লেগেছিল বিভার, কিন্তু এত চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে মন চাইছিল না। ওঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ডিপ্লোমা প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি থেকে। দেশে থাকতে একটা কলেজে সঙ্গীতের অধ্যাপিকা ছিলেন উনি। আস্তে আস্তে গানের ক্লাস খোলার আগ্রহটা বাড়তে থাকে বিভার মনে। নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর এর চেয়ে ভাল উপায় তো আপাততঃ নেই হাতে। ঠিক করলেন স্থানীয় ভারতীয় সমাজের কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তারপর এগোবেন।

সপ্তাহখানেক বাদে কমল একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে খুশী-খুশী গলায় জানাল, ''নাও, তোমার একাকিত্ব নিয়ে আর সমস্যা রইল না। মনে হচ্ছে ভগবান তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। আভাকে মনে আছে তো — তোমার সেই দূর সম্পর্কের ভাইঝি যার চোখেমুখে খই ফোটে ? ও এখানকার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাড্‌মিশন পেয়েছে। আজই মামার ফোন পেলাম। এবার তো বকবক করে কানের পোকা নড়িয়ে দেবে। ঘরে শান্তি-টান্তি আর কিছু থাকবে না।''

''বাঃ, এ তো দারুণ খবর ! তুই যখন আমেরিকা এলি, সেদিন থেকে মেয়েটা জেদ ধরে বসে আছে ও-ও আসবে এখানে। পড়াশোনায় তো ভাল ছিলই, শুধু বাবাকে রাজী করানোটাই একটু সমস্যা। শেষ অবধি দেখছি ওর বাবাকে ওর জেদের কাছে হার মানতে হল। ও বকবক করে ঠিকই, কিন্তু কথাবার্তা ভারী মিষ্টি। শুনলেই দুঃখ-টুঃখ সব দূর হয়ে যায়।''

''ভাল। তুমি ওর মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে নিও রোজ। আমার চিন্তা আমি এই ফ্ল্যাটে আর তিষ্ঠোব কী করে। মামা আবার শুনলাম ও আমাদের এখানে থাকবে এই শর্তেই নাকি ওকে ছাড়তে রাজী হয়েছে।''

''চুপ কর! তোরা ভাই-বোনে একে অপরকে কতটা ভালবাসিস আমি যেন জানিনা!''

আর সপ্তাহখানেক বাদেই আভার এসে পৌঁছনোর কথা। বিভার আনন্দের সীমা নেই। আভার মা মারা যাবার পর বেশ কিছুদিন ও এই পিসীর কাছে এসে ছিল। মেয়েটা কী কী খেতে ভালবাসে সব পিসীর মুখস্থ। তিনি ওর পছন্দের খাবারগুলো রান্না করে ফ্রিজে রাখতে শুরু করলেন। এইভাবে দিন গুনতে গুনতে অবশেষে এসেই পড়ল সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিন। কমলের তো নিজের গাড়ী নেই, সাইকেলে করেই ইউনিভার্সিটি, বাজারদোকান — সবজায়গায় যাতায়াত করে। তাই জ্যাকির গাড়ীতে ওরা দুজনে মিলে এয়ারপোর্টে আভাকে রিসিভ করতে গেল।

মোবাইলে ফ্লাইট ঠিক সময়ে এসে পৌঁছনোর খবর পেয়ে ওরা এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জে গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় আধঘন্টা বাদে কাঁধে ব্যাগ আর হাতে চাকালাগানো স্যুটকেস নিয়ে এক সহাস্য তরুণীকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সে কমলের কাছে আসতেই ওরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের মুখ থেকেই খুশী ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

''ওঃ, এই তাহলে সেই আভা দি গ্রেট — যার জন্য মা এত রান্নাবান্না করছে কদিন ধরে? কিন্তু এর চেহারায় তো তেমন কিছু আভা-টাভা দেখতে পাচ্ছিনা। একজন টিপিকাল ভারতীয় মেয়ের মতই সাধারণ দেখতে। এর জন্য এত আয়োজন, এত প্রশংসা? আমি তো ভাবছিলাম স্বর্গের পরী-টরী কেউ হবে।'' জ্যাকি আজকাল এত খোলামেলা স্বভাবের হয়ে গেছে যে অচেনা লোকের সঙ্গেও অবলীলায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। সেই ঠাট্টার সুরেই বলল কথাটা।

''হ্যালো, আপনি কে বলুন তো? আমার সম্বন্ধে এতসব কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিল?'' আচমকা এমন মন্তব্য শুনে মেয়েটার ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে।

''আমার পরিচয় বলতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। আপাততঃ এটুকু জেনে রাখুন যে আপনার কোনো দরকার-টরকার পড়লে এই বান্দা সবসময় হাজির থাকবে।'' জ্যাকি হাসতে হাসতে বলল।

''থাংক্স্, তবে আমার কাউকে দরকার পড়বে না। অন্ততঃ আপনাকে তো নয়ই। আমি নিজেই নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারি, বুঝলেন মিস্টার — কী যেন নাম —''

''আচ্ছা আচ্ছা অনেক হয়েছে। আর মজা নয়। আমার বোনের মুডটা প্রথম দিনেই এত খারাপ করে দিয়ো না।'' কমল পরিস্থিতি সহজ করতে চায়, ''আভা, এ হল আমার বিশেষ বন্ধু জ্যাকি। কথায় কথায় মজা করাটাই এর স্বভাব। চল, বাড়ী চল এবার, মা অপেক্ষা করে আছে তোর জন্য। জ্যাকি, চল, মালপত্র সব তোমার গাড়ীর ট্রাংকে তুলি।''

ওরা বাড়ী ঢুকতেই আভাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিভা আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। জ্যাকি যেন ইয়ার্কি করার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। বলে উঠল, ''আশ্চর্য্য! মা, আভা আসায় আপনার এত মনখারাপ হয়েছে যে কান্নাকাটি করছেন? ঠিক আছে, করুন, কিন্তু আপনি যে রান্নাবান্না করেছেন সেগুলো কোথায় আছে একটু বলবেন? আপনার ভাইঝি প্লেনে সারা রাস্তা প্রচুর খাওয়াদাওয়া করেছে, আর আমার এদিকে পেটে ছুঁচোয় ডনবৈঠক মারছে —''

''দূর পাগল! এতো সুখের কান্না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এত দিন পর একটা আপনজনের দেখা পেলাম।'' আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন বিভা।

''ও, তার মানে আমি আপনার আপন নই। যেদিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আমি ভেবেছি পৃথিবীতে অন্ততঃ একটা জায়গা আছে যেখানে কেউ একজন আমাকে সত্যিই নিজের লোক ভাবে। এখন দেখছি সেটা ভুল —'' জ্যাকির মুখে কপট গাম্ভীর্য্য নেমে আসে।

''আবার শুরু হল তোমার মাকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করা ? নাঃ, এই আভার হাতেই তুমি একদিন জব্দ হবে। ওকে সোজাসরল মেয়ে ভেবনা মোটেই — ও আমারও কান কেটে নিতে পারে।'' কমল জোরে হেসে ওঠে।

''তাই নাকি ? ওরেবাবা, তাহলে তো এর থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়। অবশ্য দেখে তো মনে হচ্ছেনা অতটা ভয়ংকরী।''

''চল্ আভা, তুই মুখহাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আয়। এতটা জার্নি করে এলি। ক্লান্তি লাগছে তো ? আমি খাবার-টাবার গরম করি। আর এই বদ্মাইশ ছেলেটার কথায় কান দিস না। আমারই আদরে-আদরে ও এরকম বিগড়ে গেছে।'' জ্যাকির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে মুচকি হাসেন বিভা।

''আরে না না। ইনি এখনো অবধি কোন্ কথাটা বলেছেন যেটা কান দেওয়ার মতো ?'' বলেই দ্রুত বাথরুমের দিকে হাঁটা লাগাল আভা।

''একটা দামী কথা বলি এবার। আভার দৌলতেই আমার আজ এমন স্বর্গীয় সব রান্না চাখার সৌভাগ্য হতে চলেছে। এর জন্য আপনাকে তো ধন্যবাদ দিতেই হয়, আভাজী।'' খাবার টেবিলে থরে থরে সাজানো জিভে-জল-আনা রান্নাগুলোর দিকে তাকিয়ে সোৎসাহে বলে ওঠে জ্যাকি।

''ও, আচ্ছা, আপনি ধন্যবাদ-টন্যবাদও দেন তাহলে ? আমি ভাবছিলাম ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু জানেন না।'' আভা বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল।

''আপনি যখন আমার সম্বন্ধে আরো জানবেন, দেখবেন আমার গুণাবলীর তালিকা কেমন লম্বা। কিরে কমল, ঠিক বলছি না ?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আবার কবে ভুল বল ? আচ্ছা জ্যাকি, একটা কাজ করে দেবে প্লীজ ? কাল সকালে আভাকে ইউনিভার্সিটিতে ওর ডিপার্টমেন্টে একটু পৌঁছে দেবে ? আমার আবার ডিপার্টমেন্ট হেডের সঙ্গে মীটিং আছে। ওকে সব দেখিয়ে-টেখিয়ে দিও। নিশ্চয়ই এই অফিসে সেই অফিসে ঘুরে ঘুরে নানারকম কাগজপত্র জমা দিতে হবে।'' কমল অনুরোধ করে।

''না কমলদা, আমি একাই যেতে পারব। আমার কারোর অনুগ্রহের দরকার নেই।'' ফোঁস করে ওঠে আভা।

''আরে, এই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস বিশাল। হারিয়ে যাবি তুই। এটা কি ইন্ডিয়া পেয়েছিস ? আর জ্যাকিকে আমি অনেক ব্যাপারে অনেক অনুগ্রহ করেছি — তাই না জ্যাকি ? এভাবে অন্ততঃ তার একটার ঋণ শোধ করতে পারবে —'' কমল পরিহাস করে।

পরদিন সকালে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে আভা। মনে একরাশ আশা-আশংকা। কেমন হবে নতুন ডিপার্টমেন্ট ? ভারতে থাকতে ভূগোল নিয়ে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী করেছে, নিজের কলেজে প্রথম হয়েছে। এখন ঐ বিষয়েই পি এইচ্ ডি করতে এসেছে এখানে। ওঃ, আমেরিকা আসার ব্যাপারে বাবার অনুমতি আদায় করতে কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ওকে ?

ঠিক সময়ে জ্যাকি এসে ফ্ল্যাটের বেল্ টিপল। সসম্ভ্রমে গাড়ীর দরজা খুলে সামনের সীটে বসতে বলল আভাকে। সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ল ও, গাড়ী চলতে শুরু করল।

মখমলের মতো ঘাস আর সবুজ গাছপালায় ঘেরা জিওসায়েন্সেস বিল্ডিং দেখে মুগ্ধ আভা। লিফ্টে উঠতে উঠতে দূরে তাকালে নীল সমুদ্র দেখা যায়। ভুগোল নিয়ে পড়ারই আদর্শ জায়গা বটে।

''বাঃ, সামনেই তো দেখছি সফেন সমুদ্র । দেখবেন, আবার ফাঁক পেলেই সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকবেন না । মনে রাখবেন, এখানে পড়াশোনা করতে এসেছেন । এদেশে ভারতের মতো ফাঁকি দিয়ে পড়ে বাজিমাত করা যায়না ।'' জ্যাকি রাগাবার চেষ্টা করে ।

''আপনার উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ । আমি আমার কলেজে ফাঁকি দিয়ে পড়ে ফার্স্ট হইনি । আচ্ছা, এবার আপনি তাহলে আসুন । আমি একাই বাড়ী ফিরতে পারব । আমার কাছে রোড্-ম্যাপ আছে ।''

''আর ইউ শিওর ? হারিয়ে-টারিয়ে গেলে ফোন করবেন আমাকে । ফোন নম্বরটা দিয়ে যাই ? এটা আমেরিকা । এখানে তাবড় তাবড় লোকেরাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ।''

''ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমার বিষয় ভূগোল । আমেরিকার রাস্তা-টাস্তা অবধি মুখস্থ করে রেখেছি । আচ্ছা, বাই ।''

ডিপার্টমেন্টের অফিসে যা যা কাগজপত্র জমা দেওয়ার আর ফর্ম ভর্তি করার ছিল সব শেষ করে আভা গেল নিজের থিসিস অ্যাড্ভাইসারের কাছে । রূপালি চুলের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, নাম ডক্টর জোনাথন । আভার গবেষণার বিষয়টা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করতে করতেই উনি অনেকগুলো মূল্যবান পরামর্শ দিলেন আর আজই ওকে লাইব্রেরী যেতে বললেন ।

''এখানকার লাইব্রেরীতে তোমার বিষয়ের ওপর হেন বই নেই যা পাবেনা । রিসার্চ পেপারও প্রায় সবই পেয়ে যাবে । সব ছাত্রছাত্রীই কম্পিউটার ব্যবহার করে এখানে । সবার আগে একটা থিসিস প্রোপোজাল তৈরী করতে হবে । সেটা তোমার কমিটি অ্যাপ্রুভ করলে তবে গবেষণা শুরু করতে পারবে । আশা করি তুমি যথেষ্ট পরিশ্রমী ।''

''আপনাকে হতাশ করবো না, স্যার ।''

''না না, স্যার নয়, আমাকে সবাই 'জন' বলে । তুমিও তাই বলবে ।'' হেসে বললেন ভদ্রলোক ।

অ্যাড্ভাইসারের ঘর থেকে বেরিয়ে আভা বেশ তৃপ্ত বোধ করল । ওর আমেরিকা আসার সিদ্ধান্ত ভুল ছিলনা তাহলে । বেশ ভাল অ্যাড্ভাইসার পেয়েছে একজন । এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজকর্ম শুরু করতে হবে । ঘরে ফেরার সময় মনে পড়ল জ্যাকিকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ও বলেছিল একাই ফিরতে পারবে । এখন সেটা করে দেখাতে হবে, ভয় পেলে চলবে না । ইউনিভার্সিটির বাস্স্ট্যান্ডে বড় বোর্ডে একগাদা বাসের নম্বর লেখা । তার মধ্যে থেকে নিজের বাড়ীর বাসের নম্বরটা খুঁজে নিল ও । জ্যাকি-সাহেবকে দেখিয়ে দিতে হবে ও কী চিজ্ । কতখানি স্বনির্ভর । একটু অসুবিধে হলেও শেষকালে বাড়ী ঠিকই পৌঁছে গেল । প্রসন্ন হৃদয়ে বাড়ী ঢুকছে, এমন সময় বেজে উঠল মোবাইল । ওপ্রান্তে জ্যাকি ।

''কী, কোথায় আছেন এখন ? হারিয়ে গেছেন তো ? ভয় পাবেন না, চিন্তা করবেন না । বলুন জায়গাটা কীরকম দেখতে, আমি খুঁজে খুঁজে ঠিক পৌঁছে যাব আপনাকে আনতে।''

''আপনার দায়িত্ববোধের জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার জয়কুমার । ভয় বা চিন্তার কোনো প্রশ্নই নেই । আরামসে ঘরে পৌঁছে গেছি । এখন গরম গরম পকৌড়া দিয়ে চা খাচ্ছি ।''

দশ মিনিটের মধ্যে জ্যাকি এসে হাজির । এসেই অভিযোগ, ''এ তো ভারী অন্যায়, মা ! মেয়ে এ-শহরে পা দিতে না দিতেই ছেলেকে বেমালুম ভুলে গেলেন ? ইনি রাস্তা হারিয়ে কী কান্ড বাধান সেই ভয়ে আমি সারাটা দিন লাঞ্চ অবধি করলাম না — কখন কোথা থেকে ডাক পড়ে কে জানে — আর এদিকে আপনি এঁকে একথালা পকৌড়া সাজিয়ে দিয়েছেন !''

''কী যে বলিস ? ভুলতে যাব কেন তোকে ? আভা আসার আগে তুইই তো ছিলি আমার সঙ্গী । আয় বাবা, তুইও পকৌড়া খেয়ে দেখ, বল কেমন হয়েছে ।''

''তারপর মিস্টার জয়কুমার, কী মনে হচ্ছে — আমি স্মার্ট তো ?'' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল আভা ।

''হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, একশোবার স্বীকার করছি, হাজারবার স্বীকার করছি, আপনি সুপার গার্ল। এবার আমাকে একটু মায়ের হাতের পকৌড়ার মজা নিতে দাও। তুমি তো অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছ, আমার জন্যও নাহয় দু-চারটে রাখলে।'' বলতে বলতে পুরো থালাটাই নিজের দিকে টেনে নেয় জ্যাকি। কথার ফাঁকে কখন ও 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছে, খেয়ালই হয়না আভার।

''ঠিক আছে। আমি পেটুকও নই, হ্যাংলাও নই। সারাদিন যে না খেয়ে রয়েছে তাকে খেতে দিয়ে বরং একটু পুণ্য সঞ্চয় করি।'' পরিহাসের সুরে বলে ও।

''থ্যাংক্স্। এই নাহলে ন্যায় ?'' আভার পরিহাসকে অগ্রাহ্য করে খেতেই থাকে জ্যাকি।

দিন কাটতে লাগল এইভাবে। আভার কাজকর্ম চলছে জোরকদমে, খুব খাটছে মেয়েটা। কমলও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় একদিন খবর এল কমলের একমাত্র কাকার মরণাপন্ন অবস্থা। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, অতএব কমলকেই দেশে ছুটতে হল সঙ্গে সঙ্গে। ও যাওয়ার আগে জ্যাকি ওকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিল যে ওর অনুপস্থিতিতে মা আর আভার দেখভালের দায়িত্ব সে নিচ্ছে। কমল না থাকাকালীন ও শুধু রোজ এসে খোঁজখবরই নেয়নি, ওদের সঙ্গও দিয়েছে, স্বভাবসিদ্ধ হাসিঠাট্টায় ওদের মন ভাল রাখার চেষ্টা করেছে। নাহলে ছেলের আর দেওরের চিন্তায় মা খুব বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। আভার সঙ্গে খুনসুটি করাটা জ্যাকি এত উপভোগ করে যে লাইব্রেরীতে যখন আভা পড়াশোনা করে, তখনও মাঝে মাঝে না বলেকয়ে হাজির হয়ে ওর একাগ্রতা ভঙ্গ করে। লাইব্রেরীর সেই নিরিবিলি পরিবেশে আভাকে চটাতে ফিস্ফিস্ করে বলে, ''এত পরিশ্রম করে কী হবে ? শেষমেষ তো সেই একটা বিয়েই করবে। বিয়ের পর এইসব পড়াশোনা কোনো কাজে লাগবে ? তার চেয়ে পিসীর কাছে ভাল করে রান্নাবান্না শিখলেই তো পার। স্বামীর ভালবাসা পাবার সেরা রাস্তা কোথা দিয়ে গেছে জানো তো — এই পেটের মধ্যে দিয়ে।'' বলে মিচকে মিচকে হাসে।

''ছি ছি ! এতদিন আমেরিকায় থেকেও তোমার চিন্তাভাবনা এত সংকীর্ণ ! তোমার আমেরিকান স্ত্রীকে বরং বোলো আমার পিসীর কাছে এসে ভারতীয় রান্না শিখে যেতে।''

''কে বলল আমার স্ত্রী আমেরিকান হবে ? আমার খাঁটি ভারতীয় বৌ চাই।'' বলতে বলতে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় ও আভার দিকে। দেখে মনে মনে চমকে ওঠে মেয়েটা। মুখে নির্বিকার ভাব বজায় রেখে বলে, ''এমনিতে তোমার এই সিদ্ধান্তটার অবশ্য যুক্তি আছে। কোনো আমেরিকান মেয়ে তো আর তোমার নিত্যনতুন ছেলেমানুষী খেয়ালের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেনা। তার চেয়ে কোনো ভারতীয় শেফের মেয়েকে বিয়ে কর, সে তোমাকে প্রতিদিন নতুন নতুন ডিশ রেঁধে খাওয়াবে।''

''আচ্ছা, তোমার নিজের ঐসব ব্যাপারে কি প্ল্যান ? আমি তো তোমারও একজন পাণিপ্রার্থী হতে পারি — পারি না ?''

''এসব কী যা-তা বলছ জ্যাকি ? দাঁড়াও, তোমার আস্পর্ধার কথা পিসীকে আর কমলদাকে বলতে হবে। কী মনে কর তুমি নিজেকে ? আর আমার সঙ্গে কী শত্রুতা তোমার কে জানে — একদম কাজকর্ম করতে দাওনা।'' ঝাঁঝিয়ে উঠত আভা। অবশ্য জ্যাকির এইসমস্ত কথা কোনোদিন বিভা বা কমলের কানে গিয়ে উঠত না, গোপনই থাকত।

''সরি, মাফ করে দাও। এমনি মজা করছিলাম। মুড খারাপ হয়ে গেল তো ? চল, মুড ঠিক করার জন্য তোমায় আইসক্রীম খাইয়ে আনি। পাশেই একটা নতুন আইসক্রীম পার্লার খুলেছে, দূর দূর থেকে লোকে খেতে আসে সেখানে —''

''নতুন আইসক্রীম পার্লার খুলেছে বুঝি ? বাঃ, দারুণ খবর। তুমি গিয়ে মজাসে খাও ওখানে। আইসক্রীম আমার ভাল লাগেনা। দয়া করে আমাকে একটু কাজ করতে দাও। জানোনা লাইব্রেরীতে এত কথা বলতে নেই ?''

''আইসক্রীম তোমার ভাল লাগে না ? তাহলে তো তোমার স্বামী যে হবে সে ভাগ্যবান পুরুষ। অনেক পয়সা বেঁচে যাবে তার। এখানকার মেয়েরা তো রাতদিন আইসক্রীম খেয়েই পেট ভরায়।'' জ্যাকি তার ফিচলেমি চালিয়ে যায়।

''আমার স্বামী আর তার পয়সা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল তো ? ফর্ ইওর ইন্ফরমেশন, আমার স্বামী কখনোই কঞ্জুস হবেনা, উদার হবে।'' আভার গলায় বিরক্তি।

''আমার মাথাব্যথার কারণ আজ নয়, পরে কোনোদিন বুঝতে পারবে। আসি এখন।'' বলে চলে যায় জ্যাকি। আর আভা ভাবতে থাকে ছেলেটার এইসব কথাবার্তার অন্তর্নিহিত অর্থ। যেটুকু বোঝে, ওর মতো একটা অল্পবয়সী মেয়ের কাছে তার একটাই মানে হয়। কিন্তু তাও, ও যখন বলে এসব, শুনতে তো খারাপ লাগেনা। নিজেকে আশ্বাস দেয় আভা — এসব কথা কেবল প্রেমিক-প্রেমিকারাই বলে এমন তো নয়, দুজন ভাল বন্ধুর মধ্যেও তো হতে পারে এমন কথোপকথন। বাড়ী ছেড়ে এত দূর দেশে পড়তে এসেছে ও — কত আশা করে, কত আস্থা রেখে পাঠিয়েছেন ওর বাবা এখানে। এখন প্রেম-টেম করে ফালতু সময় নষ্ট করবে, সেটা কিছুতেই হতে পারে না। জ্যাকিকে বলতে হবে আর যেন এভাবে ওকে বিরক্ত না করে।

কিন্তু ছেলেটাকে সেকথা মুখ ফুটে বলা আর হয়ে ওঠেনা। বরং একদিনের জন্য ওর সঙ্গে দেখা না হলেও মন উতলা হয় আজকাল। কাকার মৃত্যুর কারণে কমলের ফিরতে আরো দেরী হচ্ছে দেশ থেকে। এসময় জ্যাকির উপস্থিতি পিসী-ভাইঝির একটা বড় ভরসা। বিভার কাছে ছেলেমানুষী আব্দার, আভার সঙ্গে কপট রাগারাগি — এসব না থাকলে দিনগুলো বড় ফাঁকাফাঁকা লাগে।

একদিন সন্ধ্যায় জ্যাকিকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বিভা কারণ জানতে চাইলে ও বলল, ''তেমন কিছু না, মাথাটা একটু ব্যথা করছে। আপনি রোজ বিকেলে আদা দেওয়া মশলা-চায়ের বদঅভ্যাস করিয়ে দিয়েছেন। কাল তো আসতে পারিনি, তাই খাওয়া হয়নি। সেইজন্যই বোধহয়। কাল আরো বেশী ব্যথা ছিল।''

''বাঃ। যদি জানোই যে চায়ের নেশাটা খারাপ, খাও কেন ? তাছাড়া এই অভ্যাসটা ছাড়লে তো তোমার স্ত্রীর একটা ঝামেলা থেকে মুক্তি।'' আইসক্রীম খাওয়া নিয়ে আভার ভবিষ্যৎ স্বামীর পয়সা বাঁচার যে কথা জ্যাকি বলেছিল লাইব্রেরীতে, আভা তারই শোধ তুলতে চায়।

''ছেড়ে দে আভা। ওকে নেশা ছাড়ার কথা বললে ওর মাথাব্যথা আরো বেড়ে যাবে। আমি এখুনি নিয়ে আসছি আদা দেওয়া চা।'' বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান বিভা।

''সত্যি বলছ ? আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিলে তোমার ঝামেলামুক্তি ?'' জ্যাকি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে আভাকে।

''আরে আমার কেন হতে যাবে, তোমার বৌয়ের কথা বলছি। তাকেই জিজ্ঞেস কোরো সে ওটাকে ঝামেলা বলে মনে করে কিনা।''

''তাকেই তো জিজ্ঞেস করছি।''

''জ্যাকি, আমার এই ধরণের ঠাট্টা ভাললাগে না। আগেও বলেছি। এরকম করলে তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হবে।''

উত্তরে জ্যাকি কিছু বলার আগেই বিভা চায়ের কাপ হাতে ঢুকে বললেন, ''এই নে চা। সঙ্গে একটু চানাচুরও দিলাম। জানিনা কাল পেটে কিছু দিয়েছিলি কিনা। টানা অনেকক্ষণ খিদে চেপে রাখলেও কিন্তু মাথাব্যথা করে।''

''ইস্, আপনি যদি সত্যিসত্যি আমার মা হতেন —'' হঠাৎই অন্যমনস্ক দেখায় জ্যাকিকে।

''কেন, আমি তোর মা নই ?'' বিভা আহত গলায় বলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ামাত্র জ্যাকি অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। কাপ-ডিশ পড়ে গেল হাত থেকে। দুহাতে

মাথা চেপে ধরে মেঝেয় উবু হয়ে বসে মাথা মাটিতে ঠেকাল ও। যন্ত্রণায় ফ্যাকাশে দেখায় ওর সারা শরীর। পিসী-ভাইঝি দুজনেই স্তম্ভিত।

''আভা, তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরের ড্রয়ার থেকে অমৃতাঞ্জনের শিশিটা নিয়ে আয়, আর এই বিল্ডিং-এরই ওপরতলায় যে ডাক্তারকাকুর থাকেন — যাঁর সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল — তাঁকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়।'' কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে বিভা নির্দেশ দেন।

মাথায় খানিক অমৃতাঞ্জন লাগাবার পর একটু আরাম বোধ করে ছেলেটা। আস্তে আস্তে বলে, ''এখন আবার ঠিক লাগছে। ডাক্তার-ফাক্তার ডাকার দরকার নেই। আসলে কাল সারারাত একটা প্রোজেক্টের ওপর কাজ করেছি, ঘুম হয়নি, তাই বোধহয় মাথাটা —। সরি, অমন সুন্দর চা-টা ফেলে দিলাম!''

''চায়ের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবেনা, আভা এক্ষুণি আরেক কাপ বানিয়ে দেবে। একটা কথা বল তো, আগে কোনোদিন এরকম মাথাব্যথা হয়েছে তোর? আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম।''

''বললাম না, গত কয়েকদিন অনেক রাত অবধি কাজ করতে হয়েছে, তাই সারাটা দিন মাথা ভারী হয়ে থাকত। আজ হঠাৎই ব্যথাটা একটু বেশী হওয়ায় —। চিন্তা করবেন না মা, আমি ঠিক আছি।'' জ্যাকি হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনা। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট।

এর কদিন বাদে কমল ফিরল। বাড়ীতে স্বস্তি আর খুশীর আবহ ফিরে এল। বিভা নিজের আর শ্বশুরবাড়ীর হালচাল জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আভা তার বাবার পাঠানো নতুন জামাকাপড় আর মিষ্টি পেয়ে খুশী। জ্যাকি অবশ্য আসামাত্রই মিষ্টির বাক্স অধিকার করে নিয়েছে, ''বাঃ, ভারতীয় মিষ্টির জুড়ি নেই পৃথিবীতে। আভা এত মিষ্টি খেলে মোটা হয়ে যাবে, ওর না খাওয়াই ভাল। এটা আমার আর কমলের জন্য।''

''আমি মোটা হই রোগা হই তোমার তাতে কী? যাও, এখন একটা মিষ্টির দানাও আর পাবেনা, বুঝেছ?'' বলে আভা কেড়ে নেয় মিষ্টির বাক্সটা।

''হ্যাঁ, তোরা দুজন ঝগড়া কর, আমি ইতিমধ্যে মিষ্টিগুলো শেষ করে দিই।'' কমল হেসে বলে।

সময় গড়িয়ে চলল। জ্যাকিকে কিছুদিন যাবৎ একটু আনমনা লাগছে, কমলদের বাড়ীতে আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কমল জানাল ছেলেটা ডিপার্টমেন্ট হেডের একটা বড় প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিয়েছে, কাজকর্মের চাপে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারেনা, মাঝেমাঝেই মাথাব্যথায় ভোগে। মাথাব্যথার ওষুধ খেয়ে কাজ চালিয়ে যায়। একদিন তো নাকি বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়েই গেছিল। কমল জিজ্ঞেস করলে বলে, ''রাতে ঘুমটা খুব জরুরী। ওটা না হলে সারা শরীরের ব্যালেন্স বিগড়ে যায়। হাঁটতে গেলে পা টলমল করে। তুই অত ভাবিস না।''

''বুঝিনা বাবা, তোমার কাছে কাজ বেশী জরুরী না শরীর। নোবেল প্রাইজ-টাইজ পাবে ভাবছ, না কী? এই বয়সে পা টলমল করাটা কি ভাল?''

বিভাও শুনে বললেন, ''না না, এ মোটেও ভাল কথা নয়। ওকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা তো একদিন।''

''দূর, ও কারো কথা শোনে নাকি? রাতদিন কেবল ভুতের মতো খেটে যাচ্ছে।'' কমল হাল ছেড়ে দিয়েছে বোঝা যায়।

কমলদের বাড়ী জ্যাকির আসা এরপর বন্ধই হয়ে গেল। ক্রমাগত মাথাব্যথায় ভুগে যাচ্ছে ছেলেটা। কমল একদিন জানতে চাইল ওর না আসার কারণ। উত্তর পেল, ''রাতে ঘুমোতে পারিনা বলেই বোধহয় সকালে আজকাল বমি হয়।

খিদে-টিদে খুব কমে গেছে রে ভাই। মাকে বলিস, একবার এই হতচ্ছাড়া প্রোজেক্টটা ঘাড় থেকে নাবাতে পারলে পেট ভরে শুধু ওঁর হাতের রান্না খাব আর পড়ে পড়ে ঘুমোব।''

জ্যাকির ছেলেমানুষী, ঠাট্টা-ইয়ার্কি-ফাজলামি, বিয়ের প্রস্তাব — এসব খুব মনে পড়ে আভার। সেই পুরনো জ্যাকিকে খুব মিস্ করে ও। ছেলেটাকে না দেখতে পেয়ে ওর মন অস্থির-অস্থির লাগে। লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে ভাবে, এই বুঝি পাশে এসে দাঁড়াল, এবার বদ্‌মাইশি শুরু করবে। কিন্তু নাঃ, সে আর আসে না। কখনো কখনো আভার মনে হয় এই যে জ্যাকি হঠাৎ বদলে গেল, এর পেছনে অন্য কোনো মেয়ের হাত নেই তো ? ওকে ছেড়ে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে না তো ? তারপর নিজেকেই নিজে ধমক দেয়, কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ বলতে থাকে, 'কী, ছেলেটাকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলে তো ?''

একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে-কয়ে জ্যাকি কোথায় উধাও হয়ে গেল। কমলও কিচ্ছু জানেনা। ওর বাড়ীশুদ্ধ সবাই চিন্তিত — কী এমন হল যে এভাবে বেপাত্তা হয়ে গেল ? বিভা অভিমানের স্বরে জানতে চাইলেন, ''কী ব্যাপার বল তো কমল, তোকেও কিছু বলল না ? মানছি জরুরী কাজ-টাজ কিছু পড়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এর আগে তো আমাকে না জানিয়ে কোনো কাজে যেতনা ও।''

আভারও মন উচাটন, কিন্তু সেকথা প্রকাশ করবে কার কাছে ? বুকের মধ্যে একটা অজানা ভয় গেড়ে বসছে, নানা অমঙ্গল চিন্তা আসছে। কিন্তু কেন — কেন ছেলেটার জন্য এত চিন্তা ? ও তো কোনো নিকট আত্মীয়-টাত্মীয় নয়। নাকি নিজের অজান্তেই ভেতরে ভেতরে জ্যাকিকে একজন নিকটতম আত্মীয় বানিয়ে ফেলেছিল ও ?

কমলের বাড়ীর লোকেরা শুধু নয়, ইউনিভার্সিটিতে ওর ডিপার্টমেন্টের সহকর্মী আর প্রোফেসররাও জ্যাকির অপেক্ষায় উদগ্রীব। ডিপার্টমেন্ট হেড অবধি জানেন না ছেলেটা কোথায় গেছে। প্রোজেক্টের কাজে নয় নিশ্চয়ই, কারণ সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টটা তো ও শেষ করে দিয়ে গেছে। তার জন্য অনেক প্রশংসাও পেয়েছে ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ওর চাবিবন্ধ অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানাটা ছাড়া একটা লোকের কাছেও ওর কোনো হদিশ নেই।

মাসের পর মাস গড়িয়ে গেল। কমল ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং অন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে জ্যাকির খোঁজ পাওয়ার, কিন্তু কিচ্ছু মেলেনি। জ্যাকির অন্তর্ধান-পর্ব যেন এক রহস্য। আভার শয়নে-স্বপনে ঘুমে-জাগরণে মনে হয় এই বুঝি নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। সেই চিরাচরিত মোহনহাসি হেসে বলছে, ''ম্যাডাম, এত পড়াশোনা করে কাকে মুগ্ধ করতে চাইছেন ? আমি তো প্রথম দর্শনেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছিলাম। বুঝতে পারোনি তুমি ?'' বিভা মনের দুঃখে মাঝে মাঝে বলেন, ''ও এমন বৈরাগী আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির জানলে ওর সঙ্গে মা-ছেলের সম্পর্ক পাতাতাম না।''

একদিন আভা লাইব্রেরী থেকে নোট-টোট গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় লাইব্রেরীর এক কর্মচারী ওর নাম লেখা একটা খাম হাতে ধরিয়ে দিল। খামের ওপর বস্টন পোস্টঅফিসের স্ট্যাম্প। আভার মন খুশীতে নেচে উঠল। আচ্ছা, মশাই তাহলে নিজেই রহস্যের পর্দা উন্মোচিত করে আত্মপ্রকাশ করলেন এতদিনে ! দাঁড়াও, এবার খবর নেওয়া কাকে বলে দেখাচ্ছি। খাম খুলতে খুলতে হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায় ওর। কিন্তু — কিন্তু খামের ভেতর এটা তো একজন ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত নোট। বস্টনের কোন্ এক হাসপাতাল থেকে। সঙ্গে একটা সিডি।

''ডিয়ার মিস্ আভা পুরুষোত্তম,

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মিস্টার জয়কুমার শুক্লা আর আমাদের মধ্যে নেই। এই চিঠির তারিখের চব্বিশ ঘন্টা আগে আমাদের হাসপাতালের এমার্জেন্সি ইয়ার্ডে ওঁর লাইফ্ সাপোর্ট সিস্টেম খুলে নিই আমরা, কারণ ততক্ষণে উনি ব্রেন্-ডেড্ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রেন্ টিনমারের শেষ স্টেজে উনি এখানে ভর্তি হয়েছিলেন বলে আমাদের অপারেশন সফল হয়নি। অপারেশনের কিছুদিন আগে ওঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী ওঁর কিছু কথা রেকর্ড করি আমরা। তারই সিডি পাঠালাম। সম্ভবতঃ

আপনি আমেরিকায় ওঁর নিকটতম আত্মীয়, কারণ মৃত্যুর আগে উনি বারবার শুধু আপনার নামই বলেছেন। সুতরাং এটা আপনাকে পাঠানো আমাদের কর্তব্য। আরো বিশদ জানতে হলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় বা ফোন্ নম্বরে —''

চিঠির তলায় হাসপাতালের ঠিকানা, ফোন্নম্বর আর ডাক্তারের হস্তাক্ষর। পা-দুটো সীসের মতো ভারী হয়ে যেন আটকে গেছে লাইব্রেরীর সিমেন্টের সিঁড়িতে। চোখ দিয়ে কী ঝরছে ওটা — জল, না গলন্ত স্মৃতি আর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ? আজ, এই বিকেলের শেষ সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে এটাও বিশ্বাস করতে হবে তাহলে যে আর কোনোদিন কেউ মুড ভাল করার জন্য আইসক্রীম খাওয়াতে আসবে না, হাতের মিষ্টি কেড়ে খাবেনা, পড়ার সময় ডিস্টার্ব করবে না? কিন্তু ওই সিডিটা — কী আছে ওতে? কেন ওটা শুধু আভাকেই পাঠাতে চেয়েছে? যেসব কথা শোনার জন্য এতদিন মনে মনে প্রতীক্ষা ছিল, সেসবই কি? সিডিটা যেন নীরবে ওকে বলছে, ''কী, আমার অপেক্ষায় ছিলে তো? সত্যি বল তো, আমি ছিলাম না বলে মনখারাপ হতোনা তোমার? আমারও তোমার কথা সবসময় মনে পড়ত। কবে আবার দেখা হবে সেই দিন গুনছিলাম, জানো? এখন আর কোনোদিন জ্বালাব না, প্রমিস করছি।''

বাড়ীতে সকলের সামনে চালিয়ে শোনা ঠিক হবেনা সিডিটা। ডাক্তার যে বলেছেন, কথাগুলো শুধু ওকেই পাঠাতে চেয়েছিল তাঁর পেশেন্ট। একা একা কোনো নিভৃত জায়গায় নিজের সিডি প্লেয়ারে হেড্ফোন লাগিয়ে শুনবে ও তার অন্তিম কথাগুলো, এই ভেবে ওটা সযত্নে ব্যাগে লুকিয়ে রাখল আভা। বাড়ী ফিরে নিজের বেড্রুমের দরজা বন্ধ করে কাঁপাকাঁপা হাতে চালাল সেই সিডি।

হাসপাতালের কেবিনেই সম্ভবতঃ, পিছনে যন্ত্রপাতির বিপ্বিপ্ শোনা যাচ্ছে। ডাক্তার জ্যাকিকে জিজ্ঞেস করছেন,

''অপারেশনের পর সেরে উঠে সবার আগে কার সঙ্গে দেখা করবেন মিস্টার জয়কুমার?''

''আভার সঙ্গে, ডক্টর। আভা পুরুষোত্তম বলে একটি মেয়ে আছে, আমার বাড়ীর কাছে থাকে। আমার জীবনটাই আমি ওকে উৎসর্গ করে দিয়েছি।''

''আচ্ছা, খুব ভালবাসেন বুঝি তাঁকে?''

''ভালবাসা কাকে বলে সেটাই তো জানলাম আভার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর। এই যে হৃৎপিন্ডটা, ডক্টর, যার সঙ্গে হার্ট মনিটর লাগিয়েছেন — আভা তারই স্পন্দন। প্রথম আলাপেই কেন জানিনা ও আমাকে প্রবল আকর্ষণে টেনে নিল। সত্যি বলতে কী, এর আগে আমার জীবনের প্রতি আকর্ষণ ততটা ছিলনা। আমি ডিভোর্সী মা-বাবার একমাত্র ছেলে তো, কিশোর বয়স থেকে একা একাই কেটেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে জীবনের স্বাদ পেতে শুরু করলাম। ওর সঙ্গ পেতে ভাললাগে, ওকে রাগাতে ভাললাগে, আমার অসুখের এই অন্তিম স্টেজে শুধু ওর সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার আশায়ই বেঁচে আছি —''

''আপনার অপারেশনের খবর দিয়েছেন তাঁকে?''

''না না ডক্টর। যদি কোনোভাবে ভাগ্যের জোরে সেরে উঠি, একেবারে ফিরে গিয়ে সার্প্রাইজ দেব। দারুণ মজা হবে।''

''আপনার অন্য কোনো পরিচিতজন বা আত্মীয়কেও এখানে আসতে বলেননি?''

''না ডক্টর। এমনিতে আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। ওই আভাদের পরিবারটাই আত্মীয়ের মতো। আমার স্থানীয় ডাক্তার যখন ব্রেন্স্ক্যান দেখে ব্রেন্ টিউমারের ডায়াগ্নোসিস করলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাম রেফার করে আমাকে বস্টন চলে আসতে বললেন, একদম দেরী না করতে পরামর্শ দিলেন। ওঁর কথায় বুঝলাম আমার ভয়ংকর কিছু হয়েছে। সেটা ওদের বলে আর দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি।''

''মিস্ আভাও কি আপনাকে একইরকম ভালবাসেন, মিস্টার জয়কুমার ?''

''সেটা কোনোদিন জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করিনি । আমার নিজের ভালবাসার প্রতি আস্থা আছে । ও মুখে কিছু বলেনি কোনোদিন, কিন্তু আমি জানি ও-ও আমাকে চায় । আমি বাঁচতে চাই ডক্টর — আমি ভাল হয়ে যাব, তাই না ?''

''আমাদের তরফ থেকে সমস্তরকম চেষ্টা থাকবে । একটা ভাল লক্ষণ এই যে আপনার স্মৃতি এখনো অটুট আছে । সাধারণতঃ এই অবস্থায় রোগী কাউকে চিনতেও পারেনা । ঠিক আছে, এবার আরাম করুন ।''

বুকের ভেতর এত অশ্রুধারা ছিল ? এ যে থামতেই চাইছে না । মোছার কোনো চেষ্টাও করেনা আভা । নাঃ, ছেলেটা মরতে মরতেও সত্যি কথাটাই বলে গেছে । ও আসলে ভালবাসত, খুব ভালবাসত জ্যাকিকে । নাহলে জ্যাকি যখন উধাও, অত বিনিদ্র রজনী কেন কাটাতো ও ? পিসী জ্যাকির প্রসঙ্গ তুললেই মনটা উদাস হয়ে যেত কেন ওর ? এমন একটাও দিন গেছে কি যেদিন ও জ্যাকির কথা ভাবেনি ? আচমকা একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মির মতো ছেলেটা উদয় হয়েছিল ওর জীবনে । এখন সব অন্ধকার । কোনোদিন যে নিজের আত্মীয়স্বজনদের থেকে ভালবাসা পায়নি, একটা অচেনা মেয়ের ভালবাসার ওপর তার এত আস্থা ? ইস্, যদি একবার — শুধু একবার আভা সুযোগ পেত ওকে বলার যে ওর ভালবাসা একতরফা নয় । জ্যাকি, তোমার আভা তোমায় কতটা চায়, পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে যদি জেনে যেতে পারতে — হয়তো শান্তিতে মরতে পারতে ।

চোখের জলের বাঁধভাঙা নদী বইতে বইতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল । সূর্যের আলোর শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকারে ডুব দিল জগৎসংসার । চোখ মুছে নিজের বেডরুমের দরজা খুলে বাইরে এল আভা । না, জ্যাকির শেষ কথাগুলো কোনোদিন কারো কাছে প্রকাশ করবে না ও । শুধু নিজের মনের মণিকোঠায় রেখে দেবে । বিভা আর কমলকে শুধু এটুকু বললেই হবে যে একটা অচেনা লোক ফোন করে ওকে জ্যাকির মৃত্যুসংবাদ দিয়েছে । আভা সেই নম্বরে আবার ফোন্ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকটা বোধহয় কোনো পাবলিক বুথ থেকে ফোন করেছে, তাই তার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি । পিসী আর দাদা যদি শুনে ভাবে যে কেউ মজা করেছে, সেটাই বা মন্দ কী ? তাদের আদরের জ্যাকি হয়তো ফিরে আসবে কোনোদিন — এই আশাতেই বেঁচে থাকুক না ওরা ।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে । কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে । সাহিত্য তাঁর মনের আরাম । গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে । তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন ।

প্রবন্ধ

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

এই ফড়িঙের জীবনে এক কবি

শীতের বিকেলে তিমিরের বাড়ী যাচ্ছি। মির্জাপুর স্ট্রীটের ভেতরে, রমাকান্ত মিস্ত্রী সেকেন্ড বাই লেনে। তিমিরের মা দরজা খুললেন, খুট খুট করে দুবার কড়া নাড়ার পর। ঠাণ্ডা চোখে এসে দাঁড়ালেন।

– "দু বছর পর মনে পড়ল?" দরজা আটকে কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিলেন।

– "তিমিরের ঘরে গিয়ে বসো , চা মুড়ি নিয়ে আসছি।"

সময়টা ১৯৭৬। তিমিরের ঘর আগের চার বছরের মত ফাঁকা। বইয়ের তাকের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। বই খুঁটছি । একটি চটি বই, বড় জোর পচিশ পাতা, বইয়ের নাম 'পৃথিবী ঘুরছে', লেখক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম কবিতা ছোট্ট চার লাইনের, 'পৃথিবী ঘুরছে',

"চোখ রাঙ্গালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন, পৃথিবী ঘুরছে না ।
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও।
যতই তাকে চোখ রাঙ্গাও না।"

হঠাৎ উষ্ণ রক্ত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বইতে শুরু করেছিল। আমি বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে পুরানো কলকাতার রমাকান্ত মিস্ত্রী সেকেন্ড বাই লেনের স্যাঁতস্যাঁতে শীতের সন্ধ্যে। আশেপাশের বাড়ী দোকান থেকে উনুনের ধোঁয়া সেই রঙ ওঠা তেলচিটে ঘরটাকে দমবন্ধ করছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি।আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু বুকে বুলেট নিয়ে চলে গেছে। তিমিরের মত আরো কিছু চার বছরের ওপর জেলে পচছে,বাকি অনেকে দেখলে চিনতে রাজী হয় না, শুধু দুচারজন। সন্ধ্যে বেলা কথা বলতে দেখা করে। এরকম একটা নিস্তব্ধ শ্মশান সময় ।

'পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও / যতই তাকে চোখ রাঙ্গাও না'।

অনেক অনেকদিন পরে আমার মরে যাওয়া জীবনে গলা ব্যথা এনেছিলো। অমোঘ চিরন্তন পরিবর্তনকে এভাবে, চার লাইনে আনা যা ? আমরা সবাই জানি, মাথায় তত্ত্ব নিয়ে সাহিত্য বিশেষত কবিতা তৈরী বা নির্মাণ করতে গেলে ফুল ফোটেনা। অঙ্কুর গজায় না। তত্ত্ব খালি রাক্ষুসির মত মাথা নাড়ে। কবিতা হয় না। কিন্তু গভীর ভালোবাসা, অতল বিশ্বাস, নিখাদ মন যখন আগুনে ঝলসে সোনায় পরিণত হয় তখন তত্ত্বকেও ভালোবাসার কবিতায় প্রকাশ করা যায়। ১৯৭৬এর রমাকান্ত মিস্ত্রী সেকেন্ড বাই লেনের সন্ধ্যে বেলা সেই বোধ দিয়েছিল। কবিতা আমায় ভালবাসতে শিখিয়েছিল।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে আমার সেই পরিচয়। বড় কঠিন সময়ে। অন্ধকারময় ভোরের আশাহীন অন্ধকারে আমরা মুখোমুখি বসেছিলুম। অথচ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন কবিতা লিখছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। বামপন্থী কবি হিসাবে তিনি সুভাষের মত অত জনপ্রিয় না হলেও, ষাটের দশকের পরে কবিতার বোদ্ধা এবং বামপন্থীদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আমার কাছে অজ্ঞাত থাকলেও ১৯৭০এ বেরিয়ে গেছে তাঁর সবচেয়ে আলোচিত বই 'মুণ্ডহীন ঘরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে'। কবিতাটা মুখে মুখে ঘুরত। তখন বরানগর, বারাসত, হাওড়া বেলেঘাটায় পড়ে থাকা যুবকের মৃতদেহ পচে ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া সেই সব দেহ নিয়ে লিখেছিলেন।

আমি আস্তে আস্তে তাঁর কবিতার মধ্যে গা ডোবাতে শুরু করছি। এই সময় তিনি লিখেছিলেন –

"একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে
এখনো রাত শেষ হয়নি . . . . ."

বসে আছে
মাথার উপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
আর তুমি যে ভাবে পার এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিও দাও
তুমি ভয় পাওনি।

– (জন্মভুমি)

'মুণ্ডহীন ধড়গুলি'র এই কবিতা আমি পড়ছি। সেই সময় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের পেছনে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে সুরেনদার (দত্ত) নিউ বুক সেন্টারের আড্ডায় আমার যাওয়া শুরু হয়েছে। ১৯৭৭ এ বেরিয়ে এসেছে তিমির। কবি সমীর রায় ও অন্যান্য বন্ধুরা ছাড়া পেয়েছে। নিউ বুক সেন্টারে কবি কমলেশ সেনের সঙ্গে আলাপ। কবিতার পাণ্ডিত্য। সবার থেকে পৃথক হওয়ার উন্নাসিকতা। এসব কেমন করে অনেক বড় কবিকেও কৃত্রিম করে দেয়, তার আলোচনা হত। একদিন উঠল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। কমলেশদা আস্তে করে বলেছিলেন 'এ যুগের অন্যতম কবি, লিটল ম্যাগাজিনেই রয়ে গেছেন, তুমি ওঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাটা কিনে পড়ো'।

সেই আমার শুরু হয়েছে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অবগাহন। তখন সত্তরের শেষে শক্তি সুনীল সবথেকে আলোচিত। দেশ, কৃত্তিবাস শতভিষা খুব পপুলার। বুদ্ধদেবের কবিতা ম্রিয়মান। সুনীল মানে মধ্যবিত্ত মুখচোরা যুবকের কথা। 'কেউ কথা রাখেনি' কফি হাউসে মুখে মুখে। ওপর দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রহস্য ঘেরা ছন্দের জন্যে কিংবদন্তী মিথে পরিণত হচ্ছেন। তাঁর দুটো কবিতা 'অবনী বাড়ী আছো', আর অন্যটা – 'মেঘলাদিন দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে / চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুল বনে / আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম খা / আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ নড়ে বসছে না'। এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রথমেই বোঝা যায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কবিতায় প্রচলিত অর্থে রহস্য কম, কিন্তু ছন্দ কানে আটকাবে না। যখন আটকাবে বুঝতে হবে কবিতার কনটেন্টকে দৃঢ় করার জন্যে সচেতন ভাবে ভেঙ্গেছেন, যেমন –

'সময় ঝরিয়া পড়ে নির্জন দুপুরে
সেখানে বসিয়াছিলে একদিন মুখোমুখি
তোমার চুলের গন্ধ বাসি হয়ে ধুলো হয়ে ওড়ে
ক্লান্ত করে দিয়ে যায় সেখানে সূর্যের গান
তোমার আমার সেই ছোট্ট চিলে ঘরে।'

কি নিখুঁত যত্নে গুরু চণ্ডালীকে ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতাটি শেষ হয়

"কত তারা ? তারপর সব গোনা হয়ে গেলে
চোখ মেলে আবার তাকাই
সময় ঝরিয়া পড়ে, শূন্য ঘর, কাছাকাছি কোনো ঠোঁট
কোনো চোখ নাই ।"

– (সময় ঝরিয়া পড়ে – ১৯৫৬; লখিন্দর কাব্যগ্রন্থ)

ফেলে আসা প্রেমকে মন্থন করছে আজকের বর্তমান, শুদ্ধ চলিত ক্রিয়াপদ পাশাপাশি চলছে, অথচ ছন্দ কানে আটকাবে না।

আমি যখন শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়ছি, তখন একদিন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল। অবনীরঞ্জন রায় বা মন্টু বাবুর কথাশিল্পের সামনে। তখন অনেকে ঐ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে কথাশিল্পের সামনে আড্ডা দিতেন। মহাশ্বেতা দেবী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোকশিল্পী কালী বিশ্বাস, রমেন রায়চৌধুরী অনেকে। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি, কালো চশমা, পকেটে বিড়ির কৌটো। প্রথম চটকে কলেজ স্ট্রীটের ডাব পট্টির খাতা লেখা কেরানি মনে হবে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব সাধারণ এক কাগজে সম্পাদকের চাকরি করতেন। আমার সেই সন্ধ্যে এখনও এই ৩৫ বছর পরেও পরিষ্কার মনে আছে।

'আপনার লেখায় কার influence ছিল বেশী'? আমার এই ছিল প্রশ্ন। বিনা দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন – 'বিষ্ণু দে, ওরকম শব্দ নির্বাচন আর ছন্দের ওপর দখল, খুব কম কবির আছে। আমরা যখন কবিতা লেখা শুরু করেছি তখন তিনি উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালি এই বই গুলোর প্রভাব খুব ছিলো'। আমি ল্যাজ মোটা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে মন্তব্য করেছিলুম – আপনার 'তিন পাহাড়ের স্বপ্নে' কি বিষ্ণু দের সাঁওতালী কবিতা সিরিজের প্রভাব আছে ? চুপ করে থেকে হাসি মুখে বলেছিলেন 'বোধহয় হতেপারে'। সাঁওতালী কবিতায় বিষ্ণু দে অসাধারণ, দেখেছেন কি ভাবে বিষয়ের সঙ্গে শব্দ ছন্দ পালটে গেছে।

ষাটের দশকে মাঝামাঝি সময়ে লিখেছিলেন 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন'। আমি এরকম অসাধারণ শব্দ ব্যবহার খুব কম দেখেছি।

সামনে ঐ যে পাহাড় দেখছো;

রাত গভীর হলে / কোথায় সে যায় / শুধু পড়ে থাকে /
কয়েকটি নীল পালক, ...
ভোর না হতেই সে আবার ফিরে আসে / পাহাড়ের রূপ ধরে ।
মনেও হবে না নীল পাহাড়ের ডানার ছটফটানি /
কখনো শুনেছে কেউ ?

– (সামনে পাহাড়)

এই পরেই একদম অন্ত্য-মিল খেলেছেন, পরের কবিতাতে –

আয় মিতেনী আজ রাতে
চাঁদ কুড়ানো মাঝ রাতে
আবছা আলোর কান্নাতে
মুখ রেখে তুই, ঝর্ণা ধারে আয়
আয় জোয়ানের মন জ্বালা
নাচ দিয়ে সই গাঁথ মালা
চুমুর গেলাস মদ ঢালা
দে ছুঁড়ে দে, তিন পাহাড়ের গায়

– (তিন পাহাড়ের স্বপ্ন)

চোখ কেন তোর কাঁপছে মেয়ে
বুক কেন তোর দুলছে
গাল দুখানি লালচে, শরীর
সাপের মতই ফুলছে ।
কাকে মারবি ছোবল লো ?
কোন ছেলে তোর কি করলো ।

আমরা যখন এই ছন্দেতে দোলায় দেহজ প্রেমের কবিতায় প্রায় নেশাগ্রস্ত সেই একই সময়ে লিখেছিলেন একদম অন্য ধরণের কবিতা –

যে জ্যোতিষী আমার লগ্নে চাঁদ দেখতে পেয়েছিলো
সে জ্যোতিষী আমার লগ্নে চাঁদ ।
হায় রে হায় দেখতে পেয়েছিলো
তাকে আমি রম খাওয়াবো, সে যে আমার ইয়ার
রমের সঙ্গে পাঞ্চ করবো বিয়ার
রম এবং বিয়ার ।

– (নষ্ট চাঁদ)

ষাটের দশকে উঠে এসেছিল 'ভাত সিরিজ', কোনোরকম শ্লোগান নয়, কিন্তু গভীর ভালোবাসা জন্ম দিল এরকম কবিতা –

সুখে থাকো / বলে পাখি
বলে ফুল / এখন বাতাসে শীত,
ফুটপাথের ল্যাংটো / তার শীত নেই
কিন্তু খিদে আছে সুখে থাকার পৃথিবী / পড়ে থাকে
কালো মানুষের স্বপ্ন / ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়ে
ধুলোয় ধুলোয়
অনেক দূর থেকে / বাতাসে তখনও শব্দ
ভেসে আসে / সুখে থাকো
আর গন্ধ ভেসে আসে / ভাতের ।

জানিনা সত্যজিৎ রায়ের 'পথেরপাঁচালী'র বিখ্যাত কম্পোজিসন 'সুখে থাকো' লেখা থালা বাঁধা দিয়ে সর্বজয়ার চাল আনা – বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করে ছিলো কি না ।

জয় গোস্বামী লিখেছিলেন 'এ কবিতা আর বিষয়, ভাষা সব মিলিয়ে আমাদের চিরন্তন প্রকৃতির কাছে নতজানু করে দেয়' । এই সিরিজে এক বিখ্যাত কবিতা –

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে ভাত বাড়ে, ভাত খায় ।
আর আমরা সারা রাত চেয়ে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায় সারা রাত ।

ছন্দকে ভেঙ্গে দিয়েছেন, আশ্চর্য ভাতের গন্ধ শব্দ বন্ধনীটি এবং সারারাত শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেছেন, কতকটা মন্ত্রোচারণের মত ।

এই কবিতা আমি পড়ি আমার চল্লিশ বছর বয়সে । এক ধাক্কায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো চার বছর বয়সে । গ্রামের বাড়ী, সন্ধ্যে বেলায় এক চোখ ঘুম আর খিদে নিয়ে, মা আমাকে গরম ভাতের থালায় সামনে বসিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেছে । হ্যারিকেন, ঘুম ঘুম হলুদ আলো ছড়াচ্ছে । বসে আছি, মা খাইয়ে দেবে, ভাতের ধোঁয়ার গন্ধ চারদিকে ছড়াচ্ছে । ত্রিশ বছর পর আমি সত্যিই সেই গন্ধ ফিরে পেয়েছিলুম । এই স্থান কাল পাত্র পেরিয়ে একটি ছোট্ট দু লাইনের কবিতা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলো ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত আর আমার মাকে ।একে যদি মহান কবিতা না বলি কাকে বলবো ?

সত্তরে এসে তিনি কিন্তু খোলা গলায় ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ।

গুলি চলছে, গুলি চলবে, এই না হলে শাসন,
ভাত চাইলে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন্ধ গুলির মুখে,
উড়িয়ে দেওয়া চাই,
দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স
গুলি কিনতে, পুলিশ ভাড়া করতে
গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই ।

এ যেন পুরানো ছন্দের বীরেন্দ্র নতুন আঙ্গিকে ।

তিনি যখন ঠাকুরপুকুরে ক্যানসার হাসপাতালে রয়েছেন, অনেক অনুরোধে দেশ পত্রিকায় দুটি কবিতা দেন । বোধহয় সেই প্রথম ও শেষ । প্রথম কবিতাটি এরকম –

যারা কথা বলছে তারা বোবা / যারা শুনছে সকলেই জন্ম বধির
অথচ সভায় মিছিলে তিল ধারনের ঠাই নেই ।
যারা উপস্থিত তারা মৃত
কিন্তু সকলেই হাততালি দিচ্ছে
কি জন্যে এবং কাকে একজনও জানে না ।

– (লোরকার প্রতি)

দ্বিতীয় কবিতাটি –

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটা গাছ জন্মাতে পারতাম
সেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে,
যার ফলে পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম ।

দুটি কবিতাই অনেক আগের লেখা, প্রথমটি এমারজেন্সির সময়, দ্বিতীয়টি ষাটের দশকে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা যান ১৯৮৪ সালে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে। মারা যাবার পর তাঁর ডায়েরীতে বেশ কিছু কবিতা পাওয়া যায়। সব্যসাচী দেবের সম্পাদনায় 'অনুষ্ঠুপ' থেকে বীরেন্দ্র সমগ্র বেরিয়েছিল। তাঁর শেষ জীবনের মারা যাবার আগে লেখা দুটি কবিতা একটি বারো লাইনের, অপরটি চার লাইনের । প্রথমটি –

মৃত্যু কারো জন্য বসে থাকে না,
কথাটা ঠিক নয়, মাঝে মধ্যেই তাকে
অপেক্ষা করতে হয়।
সে জানে, শেষ পর্যন্ত তারই জিত, কিন্তু ছোটোখাটো হার,
মানুষের অদম্য ইচ্ছার কাছে
তাকে মেনে নিতে হয় ।
মানুষ জানে সে অমর নয়,
তবু সে কবিতা
লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে ।
মৃত্যু তখন তাঁর শিয়রের কাছে বসে ক্রমেই
নিজের ধৈর্য আর সাহস
হারিয়ে ফেলে
মৃত্যু তুমি সহিষ্ণুতা শেখো, আমদের প্রস্তুত হতে দাও ,
আমাদের অনুভব করতে দাও,
তোমার শীতল হাতের স্পর্শ কোনো ভয়ের
গল্প নয় ।

যেদিন তোমাকে সামনে রেখে শুরু হবে আমাদের অনির্দেশ যাত্রা যেন আমরা মুক্তকণ্ঠে আমাদের আপনজনেদের কাছে বলতে পারি উনি অনতিক্রম্য, আমরা খেলায় হারিনি ।

এরকম টানা গদ্যে, গদ্যছন্দে এবং 'অনতিক্রম্য' – এজাতীয় তৎসম শব্দের আচমকা ব্যবহার তাঁর কবিতায় খুব কম। কিন্তু এ কবিতায় মৃত্যুর অনিবার্য ক্ষমতাকে সামনে এনে দিয়েছে। আমার এই কবিতাটা রবীন্দ্রনাথের 'শুধু তোমার বাণী নয় গো . . . .' গানের কথা মনে পড়ায়। বার্গম্যানের সেভেন্থ শীল সিনেমার নায়কের মত, মৃত্যুর সঙ্গে হাসি মুখে সে দাবা খেলছে, হারবে জেনেও।

অন্য কবিতাটি আমার বড় মনের কাছাকাছি। মৃত্যুর সামনে বসে কবি তাঁর প্রিয়তমার সাথে কথা বলছেন। কবিতার নাম 'আমার'

কবিতা

তুমি কেমন আছো ?

যেমন থাকে ভালোবাসার মানুষ

অপমানে ।

কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা, রমাকান্ত মিস্ত্রী সেকেন্ড বাই লেন, আমার যে বন্ধুরা বুকে বারুদ নিয়ে চলে গেছে, অনাদরে, অপমানে, আগামী দিনে যারা আসবে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সবার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমার বইয়ের তাকে বসে আছেন।

নির্জন দুপুরে, গভীর রাত্রে আমরা মুখোমুখি বসি।

অনিমেষ সত্তরের দশকে ছাত্রজীবন কাটিয়েছে। ওই দশকের ভালো খারাপ সবই তার মধ্যে আছে।বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকতে চায়। সাহিত্য,সামাজিক ইতিহাস-অর্থনীতির প্রবন্ধ আর ছোটগল্পর জগতে বিচরণ করতে চায়।

MÚSICAS
MÚSICAS
MÚSICAS
MÚSICAS